তিনিই আমার প্রাণের নবি

ﷺ

সমকালীন প্রকাশন

Scanned with CamScanner

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের ডালে ভর দিয়ে খুতবা দিতেন। একদিন সাহাবিগণ নবিজির জন্য একটি মিম্বার তৈরি করলেন, যেন সেই গাছের ডালে ভর দেওয়ার বদলে সেখানে খুতবা দেন। বর্ণনায় আছে, যেদিন নবিজি মিম্বারে খুতবা দিতে এসেছিলেন, সেদিন কেঁদে উঠেছিল সেই গাছের ডাল।

আমার এ বইটি শিশুর মতো কেঁদে ওঠা সেই ডালের জন্য উপহারস্বরূপ।

আলি জাবির আল-ফাইফি

Scanned with CamScanner

প্রকাশকের অনুভূতি

সকল আনুগত্য, প্রশংসা ও স্তুতি কেবলই মহান আল্লাহর। তিনিই আমাদের রব; বিশ্বজগতের প্রতিপালক। অসংখ্য সালাত ও অগণিত সালাম প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত হিসেবে আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন দুনিয়ার বুকে।

যুগে যুগে কালে কালে পথহারা মানুষগুলোকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে প্রতিটি জাতির মাঝে নবি কিংবা রাসুল আসতে শুরু করেন। নির্ভেজাল তাওহিদ, বিশুদ্ধ জীবনাচার ও উন্নত চিন্তাধারাই ছিল তাদের চলার পথের পাথেয়। তারা মানুষকে শিখিয়েছেন সততা, বিনয়, ইনসাফ ও ন্যায়পরতা। নবি-রাসুলদের এই ক্রমধারার যবনিকাপাত ঘটেছে নবিজির শুভাগমনের মধ্য দিয়ে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন জীবন্ত এক কুরআন। কুরআনের ভাঁজে ভাঁজে পবিত্র কথামালার যে সন্নিবেশ আমরা দেখতে পাই, সেসবেরই এক জ্বলজ্বলে প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে মহানবির জীবনে। মানবজীবনের সাফল্য, অনুপম ও উৎকর্ষের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি। তার প্রতিটি কথা, কাজ, আচরণ ও উচ্চারণ হাদিস আকারে সংকলিত হয়েছে, যা আমাদের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য অতীব জরুরি। নবিজিকে সম্বোধন করে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য— ‘বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, তবে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে

Scanned with CamScanner

দেবেন। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।'[১]

প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে এ পর্যন্ত হাজারো জীবনচরিত রচিত হয়েছে। তবে সবগুলো জীবনীগ্রন্থের গুণগত মান ও লিখনশৈলী এক রকম নয়। কোনো বই কেবল নিরেট তথ্য আর ইতিহাসে ভরপুর, কোনোটি স্রেফ শিক্ষণীয় বিষয়ে আচ্ছাদিত, আবার কোনো কোনো গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে নবিজির সুমহান আখলাক। এক্ষেত্রে শাইখ আলি জাবির আল-ফাইফি রচিত বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এক অনন্য মাত্রায় অবস্থান করছে। অতুলনীয় এ গ্রন্থ গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে পাঠকদের সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু উপহার দিতে সক্ষম হবে বলে আমরা আশা রাখি।

ইতঃপূর্বে উক্ত লেখকের *লিআন্নাকাল্লাহ* তথা *তিনিই আমার রব* বইটি পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। অগণিত পাঠক নবিজিকে নিয়েও এমন হৃদয়গ্রাহী কিতাব লিখতে অনুরোধ জানান তাকে। সকলের অনুরোধের প্রতি সম্মান জানিয়ে তিনি রচনা করেন *আর-রাজুলুন নাবিল*। বইটি বাংলা ভাষায় '*তিনিই আমার প্রাণের নবি* ﷺ' নামে অনূদিত হয়ে এখন আপনাদের হাতে! ফালিল্লাহিল হামদ।

মহান রবের কাছে করজোড়ে মিনতি জানাই—আল্লাহ, আপনি এ বইটিকে কবুল করে নিন। সেই সাথে বইটি রচনা ও প্রকাশের কাজে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আপনি উত্তম বিনিময় দান করুন। আপনার দেওয়া জীবনব্যবস্থার পূর্ণ অনুকরণ করার তাওফিক দিন আমাদের। নবিজিকে তার যথাযথ প্রত্যর্পণ দান করুন এবং আমাদেরকে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করার সামর্থ্য দান করুন। ফিরদাউসের শ্যামল বাগানে আমাদের সবাইকে আপনি একসাথে থাকার সুযোগ করে দিন। আমিন।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন

---

[১] সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ৩১

Scanned with CamScanner

অনুবাদকের অনুভূতি

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদেরকে মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। সালাত ও সালাম সেই মহামানবের প্রতি, যিনি আল্লাহপ্রদত্ত সুমহান চারিত্রিক গুণাবলি দ্বারা রুক্ষ ও ধূসর মরুর বুকে জীবনের 'আবে হায়াত' রচনা করেছিলেন।

একসময় জীবনে এখনকার মতো এত কোলাহল ছিল না। ছিল সুন্দর আর পবিত্র একটি কৈশোর। জীবনের সমস্ত নৈরাজ্য ও হাহাকারমুক্ত স্নিগ্ধ একটি কিশোর-হৃদয়। সিরাতের পাতায় পাতায় তখন প্রিয় নবিজির জীবনী পড়তাম আর দু-চোখ বন্ধ করে কল্পনার ভেলায় ভেসে বেড়াতাম। প্রিয় নবিজির স্মরণে আনমনা হয়ে থাকতাম; চোখ বেয়ে কখন যে অবুঝ ভালোবাসা গড়িয়ে পড়ত টেরই পেতাম না। নবিপ্রেমের অবুঝ অশ্রুধারাটি সেই কবে শুকিয়ে গেছে, জানি না। বড় হওয়ার সাথে সাথে স্নিগ্ধ হৃদয়টিও হাতছাড়া হয়ে গেছে। কিন্তু আমার কি জানা ছিল, কৈশোরের সেই অবুঝ ভালোবাসা ও অশ্রুগুলোকে দুই মলাটের ভেতর কিছু শব্দ ও বাক্যের মাঝে যত্ন করে আমার জন্য রেখে দিয়েছেন কেউ?

নবিজিকে নিয়ে লেখা এই বইটি রচনা করেছেন আরববিশ্বের তুমুল জনপ্রিয় লেখক শাইখ আলি জাবির আল-ফাইফি হাফিযাহুল্লাহ। বিষয়বস্তু সিরাত হলেও রাসুলুল্লাহর মানবিক গুণাবলি ও ব্যক্তিজীবন বইটির মূল আলোচ্য বিষয়। অন্যভাবে, এ বইটিকে বিষয়ভিত্তিক সিরাতও বলা চলে। সিরাতের অপ্রধান কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ই এতে স্থান পেয়েছে। লেখক এখানে শব্দসংখ্যার চেয়ে গুণগত মান

Scanned with CamScanner

ও রুচির ব্যাপারে অধিক মনযোগী ছিলেন। ফলে এ বইটি কলেবরে ততটা বৃহৎ হয়নি, যতটা বৃহৎ হয়ে থাকে বাজারের অন্য সিরাতগুলো।

বইটির প্রকাশভঙ্গির সাবলীলতা, হৃদয়গ্রাহিতা ও ভাষাগত সৌন্দর্য আসলেই অতুলনীয়। লেখকের ভাব ও আবেগের যে উচ্ছ্বাস, বর্ণনাভঙ্গির যে মোহনীয়তা ও গতিময়তা, ভাষা ও সাহিত্যের যে ছন্দময় মেলবন্ধন, তাতে এটাই বিশ্বাস হয় যে, কলম বা কিবোর্ড চেপে নয়, লেখক হৃদয়ের গহীন থেকে নবিপ্রেমের সারাৎসার নিংড়ে বইটি রচনা করেছেন। তবে, একটা নিশ্চিত দ্বন্দ্বের কথা আমি এখানে বলে রাখতে পারি। পাঠকের মনে মাঝেমধ্যে এ প্রশ্নটি উদিত হবে—সৌন্দর্যটা কি আদতে লেখার সৌন্দর্য নাকি যার সম্পর্কে লেখা হয়েছে তার সৌন্দর্য? কারণ তিনি যে ধরণীর মহত্তম ও সুন্দরতম পুরুষ!

অনুবাদ করতে গিয়ে সাধ্যের সীমানায় চেষ্টা করা হয়েছে যেন ভাবের তরঙ্গ ও আবেগের উচ্ছ্বাস যথাযথরূপে বিরাজমান থাকে। নিশ্চয় চেষ্টা ও সাধনা আমার পক্ষ থেকে, আর সাফল্য ও পূর্ণতা কেবল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। মহামহিম আল্লাহ যদি কবুল করে নেন এবং মুমিন পাঠকদের অন্তরে নবিপ্রেমের জোয়ার সৃষ্টি করে দেন, তবেই এ শ্রম সার্থক হবে, ইনশা আল্লাহ।

নবিজিকে নিয়ে রচিত অনন্যসাধারণ এই বইটি অনুবাদ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এজন্য মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সমকালীন প্রকাশনের প্রতি, এমন মহতী একটি কাজে আমাকে শরিক করার জন্য। স্মরণ করছি ভাই আব্দুল্লাহ মজুমদারকে, যিনি বইটির কাজ কিছুটা এগিয়ে রেখেছিলেন।

রাব্বে কারিমের কাছে প্রাণখুলে দুআ করি, যেন তিনি আমাদের সকলের ভালো কাজগুলোকে কবুল করে নেন। রাহমানের কাছে বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন এই বইটিকে প্রিয় নবিজির হাতে 'আবে কাউসার' পান করার অসিলা বানিয়ে দেন। আমিন।

আব্দুল্লাহিল মা'মুন

৭ মুহাররম, ১৪৪২

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা	১৩
পড়ো তোমার রবের নামে	১৫
সবুজ পাতা	২৪
ভোলা যায় না!	৩৫
তীব্র সংকট	৪২
পবিত্রতম অংশ	৪৯
তুচ্ছ যে জীবন	৫৬
নিজেকে ভুলে যাওয়া	৬৫
সর্বোত্তম পরিধেয়	৭২
যেন তিনি সাধারণ কেউ	৭৮
প্রেরণার বাতিঘর	৮৬
নিষ্পাপের প্রিয়জন	৯৭
বৃষ্টির সুবাস	১০২
মদিনায় নেমে আসে ঘোর অন্ধকার	১০৮

Scanned with CamScanner

প্রারম্ভিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর। সালাত ও সালাম পাঠ করি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, তার সাহাবি ও পরিবারের ওপর।

আমার মন বেশ কয়েকদিন ধরে বলছে প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি জীবনী লিখতে; নবিজির সময়টা কেমন ছিল তা জানাতে; তার পবিত্র, স্বচ্ছ চরিত্রের গুণাবলি সম্পর্কে লেখার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে। সত্যি বলতে, ভয় হয়েছে, দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছি। হতবুদ্ধি হয়ে থমকে গেছি বহুবার।

পাঠকের কাছে গোপন করব না, আমি আগেও কয়েকবার চেষ্টা চালিয়েছি। ১২ বছর আগে একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলি নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলাম। তবে যা কিছু লিখেছি সব হারিয়ে গেছে সময়ের আবর্তে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি ভাগ্যে উত্তমটাই লিখে রেখেছেন।

দুই বছর আগে আরেকবার শুরু করেছিলাম। ছুটির মাঝে যতবার সুযোগ পেতাম তা দেখতাম, পরিবর্তন আনতাম, পরিবর্ধন করতাম। মহান আল্লাহ তাঁর পছন্দ অনুযায়ী সেটা পূর্ণ করার সুযোগ দিলেন।

আর যে বইটি এখন পড়ছেন, মাত্র দুই মাস আগে এটার চিন্তা মাথায় এসেছে। হঠাৎ বুঝলাম আমি লিখতে শুরু করেছি। যেন আমার জন্য একটা পথ খুলে গেল, আমি সে পথের সব অলিগলি চিনে এগুচ্ছি। বইয়ের প্রতিটি বাক্য লেখার মাঝে আমি প্রশান্তি খুঁজে পাচ্ছি । কিছু নেওয়া হয়েছে নবিজির সীরাহ থেকে, কিছু সংকলন-

Scanned with CamScanner

গ্রন্থ থেকে, আবার কিছু সাহাবিগণের জীবনী থেকে। যদি ভুল বলে না থাকি, মনে হচ্ছিল, সব মিলিয়ে 'মুহাম্মাদি' আবেশ। বিষয়ভিত্তিক সীরাহ বলা যেতে পারে বইটিকে। কত বেশি লিখলাম সেটায় জোর দিইনি; বরং পাঠকের রুচির প্রতি মূল লক্ষ রেখেছি; যেন পাঠক এই মহান নবিকে ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে পারে।

আমার লেখা *লিআন্নাকাল্লাহ (তিনিই আমার রব)* বইটি প্রকাশ পাওয়ার পরে বেশ কয়েকজন ভাই আমাকে প্রস্তাব দিলেন, 'তুমি কেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী নিয়ে কিছু লিখছ না? হয়তো আল্লাহ তোমার জন্য এত সহজ করে দেবেন যে, উঠতি বয়সি তৃষ্ণার্ত প্রজন্ম তার জীবনী জানতে পারবে, তাকে অনুসরণ করতে উৎসাহিত হবে।'

হয়তো তাদের ইচ্ছার পাশাপাশি এ বিষয়ে আমার আগের পড়াশোনা ও সর্বোপরি আল্লাহর ইচ্ছায় এই সামান্য কাজটি প্রকাশিত হচ্ছে। যদিও আমি মনে করি বইটি আরও ঠিকঠাক করা উচিত। নবিজির ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলবে এমন আরও কিছু অধ্যায় বাড়ানো যেতে পারে। ভবিষ্যতে বইটিতে এই সংযোজনগুলো করতে হবে অথবা একাধিক খণ্ড প্রকাশিত হলে সেখানে দেওয়া যাবে।

যারা আমাকে লিখতে বলেছিলেন, দুআ করেছেন, ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন, পড়ে দেখেছেন, তাদের সবাইকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন। বিশেষ করে শাইখ আহমাদ ইবনু গানিম আল-আসাদির কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তিনি এ পর্যন্ত নবিজির অসংখ্য সীরাত প্রণয়ন করেছেন। আমার এই বইটি পড়ে তিনি বেশ কিছু তথ্য সংশোধন করেছেন, গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এ বইটিতে বারাকাহ দান করেন, বইয়ের লেখক, লেখকের পিতা-মাতা, পরিবার, পাঠক-সহ সমস্ত মুসলিমকে ক্ষমা করেন।

আরও প্রার্থনা করি, তিনি যেন কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তাঁর নবির সুপারিশ লাভ করে ধন্য হওয়ার সুযোগ দেন। সালাত ও সালাম সেরা সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, সাথে তার পরিবার ও সাথিগণের ওপর।

আলি জাবির আল-ফাইফি

Scanned with CamScanner

পড়ো তোমার রবের নামে

ফিরে যাই সাড়ে চৌদ্দ শ বছর আগের পৃথিবীতে। মক্কার কোনো এক কর্মব্যস্ত ও প্রাণচঞ্চল বাজার।

ইয়েমেন থেকে কেনা কাপড়ের টুকরো বিক্রি করছে একজন। দাম ধরেছে অনেক বেশি, যাতে হাজিদের থেকে ভালো একটা অর্থ উপার্জন করা যায়। এই দিয়ে সে জীবিকার মান উন্নীত করবে।

আরেকজন দোকান সাজিয়েছে ভারতীয় তরবারি ও ঢাল দিয়ে। লোকে দাঁড়িয়ে দেখছে কত নিঁখুত অস্ত্রগুলো।

এরই মাঝে এক মহিলা পানি পান করাচ্ছে সবাইকে। ভিড় জমেছে বাজারে প্রবেশের পথে। ঘোড়া-বিক্রেতাকে ঘিরে ধরেছে একদল ক্রেতা। লোকটা চিৎকার করে ভালো জাতের ঘোড়ার বর্ণনা দিচ্ছে। দাবি করছে—অন্য সব ঘোড়ার মাঝে তার ঘোড়াটাই শ্রেষ্ঠ।

দোকানে মহিলারা প্রবেশ করছে শালীনভাবে। নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি কিনে ফিরে যাচ্ছে সলজ্জ ভঙ্গিতে।

অদূরে গাছের নিচে বসে আছেন এক যুবক। নাম তার মুহাম্মাদ। শান্ত স্বভাব, মধ্যম গড়ন। বাজারের অন্যান্য মানুষের মতো তার সামনেও পণ্য ছড়ানো। তবে অন্য বিক্রেতাদের মতো তিনি শুধু পণ্যের ভালো দিকটাই বলছেন না, সমস্যাটাও

Scanned with CamScanner

জানিয়ে দিচ্ছেন। পণ্যের ত্রুটি শুনেও কোনো ক্রেতার আগ্রহ কমছে না; বিক্রেতা যে খুব বিশ্বস্ত একজন!

বাজারের সবগুলো মানুষের চোখে জীবন কেবল দীনার-দিরহামে সীমাবদ্ধ। শোরগোলের মাঝে তাদের মনে ঘুরতে থাকে আরও বেশি পাওয়ার চিন্তা। অবাক হওয়ার কিছু নেই, এটা বাজার। অবাক তখনই লাগে, যখন এমন বাজারে কেউ নিজের পণ্যের দোষ জানিয়ে বিক্রি করে।

আরও অবাক করা বিষয় হলো সে যুবকটিকে ঘিরে আছে মূল্যবোধের বেষ্টনী; যে কারণে তার কাছে দীনার-দিরহামের গুরুত্ব ছিল অল্প। তিনি যেন বাজারে কিছু বিক্রি করতে আসেননি, এসেছেন বিনামূল্যে নিজের মূল্যবোধ ও বিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে।

মক্কার উপত্যকায়, বাজারের অলিগলিতে মানুষের মুখ দিয়ে যে মিথ্যাগুলো বের হতো, সেসব তিনি শুনতেন। আর সেগুলোকে তিনি প্রতিহত করতেন সত্য দ্বারা। যেন কল্পনা করতেন—সত্যগুলো মিথ্যার মৃত স্তূপের ওপর সদর্পে বিচরণ করছে।

তার চোখে যেন প্রশ্নেরা জ্বলজ্বল করত, 'সত্য ছাড়া এ জীবনের মূল্য কোথায়? বিশ্বস্ততা ছাড়া বেঁচে থাকার কী মানে হয়? মাহাত্ম্য ছাড়া জীবিত থেকে কোনো লাভ আছে কি?'

সেদিনের সূর্য ডুবছে প্রায়। প্রত্যেক বিক্রেতা নিজেদের ঝুলি খুলছে। চামড়ার থলে খুলে গুনে দেখছে দীনার-দিরহাম, যেগুলো তারা উপার্জন করেছে ডাহা মিথ্যা বলে। লাত-উজ্জার শপথ করে তারা দাবি করেছে, এগুলোই সবচেয়ে ভালো পণ্য। অন্যদিকে মুহাম্মাদ চলে যাচ্ছেন তার স্ত্রী খাদিজার গৃহে। তাদের নিয়ে ভাবছেন, যারা লাভ করার জন্য মিথ্যাচারকেই বানিয়েছে একমাত্র অবলম্বন, যারা মনে করে, কৃত্রিমতা ও প্রতারণা ছাড়া জীবন চলবে না।

ঘরে পৌঁছুলেন তিনি। স্ত্রীর দিকে থলেটা বাড়িয়ে দিলেন। খাদিজা তার জন্য খাবার তৈরি করে রেখেছিলেন। সেই খাবার হাতে নিয়ে চলে গেলেন এমন স্থানে, যেখানে অনাচার দেখা চোখ দুটো শীতল হয়, বিক্ষিপ্ত মন শান্ত হয়।

Scanned with CamScanner

গুহার পথে

তিনি পথ চলেছেন একাকী। চলতি পথের গাছ আর পাথর যেন তার উপস্থিতি টের পায়, শ্রদ্ধার এক আবেশ ঘিরে ধরে ওদের। তার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন মেশকের সুরভি ছড়ায়। যে পাহাড়গুলোর দিকে তিনি তাকিয়ে থাকেন, যে পাহাড়গুলো তার দিকে চেয়ে আছে—উভয়ের সৌরভ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

কেন বেছে নিলেন একাকিত্বকে?

মানুষের অবস্থা তাকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। অনুভূতি ও বিশ্বাসকে ঘিরে তাদের ক্রমাগত মিথ্যাচারে তিনি পরিশ্রান্ত। চারিদিকে সবকিছুতে যেন অবিশ্বাসের বিষবাষ্প। মিথ্যা আর কৃত্রিমতার কত রং! অথচ তিনি একটা শুভ্র রংই ধারণ করেছেন, হৃদয়ে জ্বেলেছেন সত্যের মশাল।

ওরা সবাই সিজদা করে মূর্তির। এ মূর্তিগুলো তার ভালো লাগে না কোনোভাবেই!

এরা জবাই করে মূর্তির জন্য, শপথ করে লাত-উজ্জার নামে, লিপ্ত হয় ব্যভিচারে, ধোঁকাবাজি করে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, কবর দেয় জ্যান্ত কন্যা সন্তানকে! একটামাত্র উট চুরি হলে কিংবা একটামাত্র কথার জের ধরে যুদ্ধ বাধিয়ে ফেলে। এমন কোনো খারাপ কাজটা নেই, যা তারা করেনি। যত অন্ধকার, যত অমানিশা—সব হয়ে গেছে তাদের স্বভাব। এসবের জন্যই তারা সংগ্রাম করে, শোরগোলে মাতে!

এই অন্ধকার জীবন মুহাম্মাদের জন্য না। তিনি যতই চেষ্টা করেন জীবনের ক্যানভাস থেকে কালো রং মুছে দিতে, ততই ধুলোর আস্তর পড়ে যায়। জীবনে সাদা রং যোগ করা বড় কঠিন হয়ে গেছে। তাই তো তিনি অজ্ঞতা-অনাচারকে ঠেলে দিয়েছেন পেছনে। যখনই সুযোগ পান, চলে যান সুদূর পাহাড়ের চূড়ায়। সে পাহাড়গুলো কি চুপিসারে কিছু বলে, যা তিনি কান পেতে শোনেন, কিন্তু বোধগম্য হয় না? যেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে চায় ওরা। যেন কিছু একটা জানান দিতে চায়, যেটা তিনি এখনো বুঝে উঠতে পারেননি।

তিনি পৌঁছে যান পাহাড়গুলোর প্রান্তে। যে অনুভূতি তার মনে আসে, তা সমগ্র মক্কাবাসীর জন্য বোঝা কঠিন। সে অনুভূতির সামনে জীবনটা সামান্য হয়ে আসে, তুচ্ছ মনে হয়।

Scanned with CamScanner

তিনি দেখতে পান সেই গুহা, কেমন যেন একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে এর সাথে। উঠে যান মাঝারি আকারের পাথর ডিঙিয়ে। প্রবেশ করেন গুহায়। যেন মিলিত হয় দুটি আলো—একটি আলো তার থেকে বিকীর্ণ হয়, অন্যটি তার ভেতরে প্রবেশ করে।

থলেটা গুহার কোনো এক পাশে নামিয়ে রাখেন তিনি। বিছানা পেতে পরিষ্কার হয়ে বসে পড়েন ইবাদতে। এই সেই ধর্মপরায়ণতা, যেটা তার জীবনের চালিকাশক্তি, তার চলার পথে সঙ্গী। সেখানে তিনি ঘোষণা করে চলেন সৃষ্টিকর্তার পবিত্রতা। চারিদিকের মানুষ এ স্রষ্টাকে ছেড়ে পাথর, গাছ, সূর্য, চাঁদ, প্রবৃত্তি-সহ আর যা কিছুর ইবাদত করে, তা থেকে তিনি পবিত্র। তারা খেজুর, চর্বি, ইট, মাটির তৈরি প্রভুর সিজদায় লুটিয়ে পড়েছে। তারা ছেড়ে দিয়েছে সাত আসমান ও জমিনের রব আল্লাহকে, যিনি মহান আরশের রব।

কে জানে, মুহাম্মাদের হৃদয়ে কোথা থেকে সেই আলো এসে পড়ল! তার অন্তরে কোন উপায়ে সেই জ্যোতির্বলয় খাপ খাইয়ে নিল?

সাদ গোত্রের গিরিপথে তার বুক চিরে ফেলার ঘটনাই কি শুরু? যখন ৪ বছর বয়সে তিনি বাচ্চাদের সাথে খেলছিলেন, অপরিচিত দুজন লোক এসেছিলেন। তিনি ছাড়া সবাই পালিয়ে গিয়েছিল তখন। তারা তাকে মাটিতে শুইয়ে বুক চিরে কালো একটা রক্তপিণ্ড বের করে নেয়। একজন অন্যজনকে বলে, 'এটা তার ভেতরে শয়তানের অংশ।'

শয়তানের অংশ বের করে ফেলেছিলেন দুজন। ফলে তিনি হয়েছিলেন এমন মানুষ, যার মাঝে শয়তানের কোনো কুমন্ত্রণা কাজ করত না।

তারা তার হৃদয় ভরে দিয়েছিলেন আলোতে। ধুয়েছেন পবিত্র পানিতে। তারপর তা ফিরিয়ে দিয়েছেন যথাস্থানে। সবশেষে এঁটে দিয়েছেন বুকের চিড়।

এই ঘটনাই কি তবে এ মানুষটার হৃদয়ে আলোর সূচনা? নাকি এর আগেও ভিন্ন কিছু হয়েছে? সীরাতগ্রন্থগুলো তো অন্য কথা বলে। যেদিন তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছেন, সেদিনই অনুভূত হয়েছিল ভিন্ন কিছু। যেন জীবনের প্রথম দিন থেকেই তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন মাহাত্ম্য ও পরিশুদ্ধতার।

Scanned with CamScanner

তার জন্মের আগে থেকেই আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, দুনিয়ায় খুব মহিমান্বিত কেউ আসছেন। সূর্যের আলো যেমন পৃথিবীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এই মানুষটিও তেমন। তিনি এসে আলোকিত করবেন সমগ্র পৃথিবী। তার চিন্তা-ভাবনার উৎস হবে আসমান।

তার মা আমিনা বিনতু ওয়াহাব দেখতে পান, একটি আলো ছড়িয়ে পড়ল, যে আলোয় আলোকিত হলো শামের সুবিশাল প্রাসাদগুলো!

যেন সমগ্র পৃথিবী তার অপেক্ষায় ছিল। আল্লাহ এ মানুষটার মাধ্যমে অবসান ঘটিয়েছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন মানবতার। তার হাত ধরেই থেমে গেছে মেকিত্বের প্রসার, উত্তাল পাপাচার।

পরিবর্তন

তিনি আপন যিকির-তাসবিহতে মগ্ন। হঠাৎ এক অপরিচিত আগন্তুক ঢুকে পড়ল গুহার ভেতরে।

মুহাম্মাদ দাঁড়িয়ে গেলেন। মুখোমুখি হলেন সেই আগন্তুকের। তার শরীরে আলাদা একটা ঘ্রাণ পেলেন। ঠিক সেই দুজনের মতো, যারা ছোটবেলায় তার বক্ষ বিদারণ করেছিল।

আগন্তুক এগিয়ে আসছেন, যেন আসমান তার দিকে এগিয়ে আসছে, নিয়ে আসছে সপ্ত-আকাশের সুরভি। তিনি যে অনুভূতির সঞ্চার করছেন, তা আর যা-ই হোক, পার্থিব কিছু নয়।

তিনি যে জিবরিল, মহান ফেরেশতা! তিনি এসেছেন এই মানুষটিকে আল্লাহর কাছ থেকে এক বিশেষ বার্তা দিতে।

মুহাম্মাদ তো শুদ্ধতায় ভরপুর একজন মানুষ। তার ভেতরটা আলোয় পরিপূর্ণ। মনের গভীরে যে জগৎ, তাতে রয়েছে পরিচ্ছন্নতার ছাপ। এমন হৃদয়ে সর্বোত্তম বার্তা অবতীর্ণ হবে না তো আর কোথায় হবে! এ বার্তা গ্রহণে যে সুউচ্চ পর্বতমালাও অক্ষম! যদি এ বার্তা নাজিল হতো পর্বতের ওপর, তবে তা আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যেত তখনই![১]

---

[১] সুরা হাশর, আয়াত : ২১

Scanned with CamScanner

মুহাম্মাদ আজ প্রস্তুত। ছোট্ট পাহাড়ের গুহায় আজ তিনি পাহাড়ের চেয়েও দৃঢ়তা নিয়ে প্রস্তুত। জগতের পবিত্রতম পানির চেয়েও তিনি বেশি পবিত্র। ছায়াপথের যত নক্ষত্র আছে, তার চেয়েও বেশি আলোকিত।

জিবরিল কাছে এলেন। মুহাম্মাদের মনে বিস্ময়। হাজারো প্রশ্ন ভিড় করছে জিজ্ঞাসু মানসপটে। হঠাৎ জিবরিলের আওয়াজে গমগম করে উঠল গুহার প্রতিটি দেয়াল।

'পড়ুন!'

একটা মহান কিছু তার ওপর নাজিল হচ্ছে। এর মাহাত্ম্য হলো একে পড়তে হয়। কয়েক মুহূর্তের মাঝে তার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে আল্লাহর পবিত্রতম বাণীর প্রথম শব্দগুলো। তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে শরীরের প্রতিটি কোষ।

'পড়ুন!'

মুহাম্মাদের উত্তর, 'আমি পড়তে পারি না।'

নিরক্ষর মুহাম্মাদ হতবিহ্বল। তিনি কীভাবে পড়বেন!

জিবরিল সজোরে চেপে ধরলেন তাকে। সে চাপের মাঝে ছিল অসীম শক্তি, ছিল তীব্রতা! মুহাম্মাদের মনে হলো যেন মৃত্যু এসে গেছে।

'নিশ্চয় আমি আপনার ওপর নাজিল করব গুরুভার বাণী।'[১]

সেই ভারী বক্তব্যকে বোঝার জন্যই তো এত প্রস্তুতি। তীব্র সেই বার্তা পৌঁছানোর জন্যই তো এই চাপ, এই আলিঙ্গন। এভাবেই জানিয়ে দেওয়া হলো, আসমানের কোনো এক মহান জিনিস তার হৃদয়ের আলো স্পর্শ করবে। সে আলো কেবল মক্কায় নয়, ছড়িয়ে পড়বে সাতটি মহাদেশে। অবসান ঘটবে গভীর অমানিশায় নিমজ্জিত এক যুগের।

জিবরিল তাকে ছেড়ে দিলেন। আবার বললেন, 'পড়ুন!'

সেই একই উত্তর, 'আমি পড়তে পারি না।'

---

[১] সুরা মুযযাম্মিল, আয়াত : ৫

Scanned with CamScanner

জিবরিল আবারও তাকে জড়িয়ে ধরলেন। যে বার্তা নাজিল হবে, তা কতটা ভারী, কতটা মহান, কাজটা কত কঠিন—তা বোঝানোর জন্যই।

তাকে ছেড়ে দিলেন জিবরিল। আবারও বললেন, 'পড়ুন!'

আবারও মুহাম্মাদের উত্তর, 'আমি পড়তে পারি না।'

আবারও সেই চাপ, যার তীব্রতা মৃত্যুর সমান। যার মাহাত্ম্য জীবনের সমান। একই আলিঙ্গানে জীবন-মৃত্যুর সমন্বয় ঘটেছিল যেন। যেন সূচনা হয়েছিল আলোকিত জীবনের, ঘটেছিল পৌত্তলিকতার মৃত্যু!

সমগ্র বিশ্বজগৎ কান পেতে শোনে, আসমান থেকে জমিনে অবতীর্ণ হওয়া বার্তার প্রথমাংশ। আকাশের সুউচ্চ দরজা থেকে যেন নেমে আসে অপার্থিব আলোকচ্ছটার প্রথম সুতো—

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

পড়ুন, আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবাঁধা রক্ত থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।[১]

এমনটাই বলেছিলেন জিবরিল। তা-ই শুনে অবনত হয়েছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহের প্রতিটি কোষ। বিশ্ব চরাচরের প্রতিটা অণু যেন আন্দোলিত হয়েছিল সুসংবাদে। সে মুহূর্তেই কুরাইশের যুবক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি আব্দিল মুত্তালিব ইবনি হাশিম পরিণত হন নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে। সৎ, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ব্যক্তিটা হয়ে গেলেন মহান এক নবি। বিশ্ববাসীর একজন সাধারণ সদস্য থেকে আবির্ভূত হলেন বিশ্বজগতের জন্য রহমতরূপে।

কিছুক্ষণ আগেও যে মানুষটা ছিলেন সাধারণ এক ব্যক্তি, ওহি নাজিলের পর পরিণত হলেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বে। হলেন সৃষ্টিকুলের মাঝে সর্বোত্তম মানুষ। তাকে সামান্য জ্ঞান

---

[১] সুরা আলাক, আয়াত : ১—৫

Scanned with CamScanner

দান করার কোনো সুযোগ নেই। তার ব্যক্তিত্ব তখন পাহাড় থেকে ভারী, আসমান থেকে বিশাল, বিশ্বজগতের সৃষ্টিসমূহের মাঝে সবচেয়ে বিস্ময়কর! সে ব্যক্তিত্বের প্রভাব সূর্য-কিরণ থেকেও অনেক অনেক বেশি।

হেরা গুহায় যা ঘটেছিল, তা কোনো ভাষার কোনো কথামালা দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেটা যে ছিল নবুওয়াত, রিসালাত ও মনোনয়নের প্রথম মুহূর্ত!

'আল্লাহই ভালো জানেন তিনি কোথায় তাঁর বার্তা পাঠাবেন।' তিনিই তো তাঁর বার্তাকে এমন হৃদয়ে অবতীর্ণ করতে পারেন, যে হৃদয় সেই বার্তা সম্পর্কে কিছুই জানে না, বার্তা আগমনের ব্যাপারে উদ্বেলিতও নয়।

'আপনি তো ইতঃপূর্বে ছিলেন অজ্ঞাতদের একজন।'

তাই জিবরিল যখন গুহা থেকে বের হন, বেরিয়ে পড়েন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও। তিনি তখন ভীত-সন্ত্রস্ত। বিস্ময়ে হতবাক। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। শরীরটা ক্রমশ কাঁপছে। যেন এই মুহূর্তে কোনো ভূমিকম্প থেকে বেরিয়ে এলেন। অথবা কোনো বিস্ফোরণ থেকে; যে বিস্ময়ের সূত্রপাত তার আলোকিত হৃদয়ে।

কাঁপতে কাঁপতে তিনি চলে এলেন প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজার কাছে। বললেন, 'আমাকে চাদরে ঢেকে দাও। আমাকে চাদরে ঢেকে দাও।' একজন মানুষের পক্ষে যতটা শীত অনুভূত হতে পারে, তার সবটাই যেন অনুভব করছিলেন তিনি। এ শীতলতা তখনই আসে, যখন একজন মানুষ সাধারণ জীবনযাপনের ঊর্ধ্বে উঠে যান, পরিণত হন এমন মানুষে, যার কাছে সকাল-সন্ধ্যা আসমান থেকে প্রত্যাদেশ আসে।

খাদিজা তার বাড়িতে থাকা সমস্ত পোশাক দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন। শান্ত হলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। খাদিজা জানতে চাইলেন কিছু হয়েছে কি না। তিনি যা দেখলেন, যা অনুভব করলেন, যা শুনতে পেলেন তার সবটুকু জানালেন স্ত্রীকে। খাদিজা বললেন, 'কক্ষনো না! আল্লাহ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না!'

খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার সেই উক্তিটি ছিল এই মহান মানুষটির জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ। তিনি সারাটি জীবনে কখনো লাঞ্ছিত হননি, সর্বদা আল্লাহকে পেয়েছেন তার পরম সাহায্যকারী হিসেবে, একমাত্র পৃষ্ঠপোষক হিসেবে।

Scanned with CamScanner

দিন কেটে যায়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়ে নবুওয়াত। তার বেশ কিছু অনুসারী তৈরি হয়; যারা তার পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করে। আবার কিছু শত্রুও জুটে যায়; যারা তার বিরুদ্ধে সব ধরনের শত্রুতা জারি রাখে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়ে গেলেন সকলের আলোচ্য বিষয়। বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে আবির্ভাব ঘটল তার। তিনি এমন এক জীবনপদ্ধতির বার্তাবাহক, যা অনুসরণীয়।

তিনি হলেন মহানুভবতা, ভালোবাসা আর বিশ্বস্ততার প্রতীক। এ বইয়ে আমরা সময় কাটাব তার গুণাবলির সাথে, তার ঐশী প্রেরণার সাথে। তার মহত্তম চরিত্র ও গুণাবলি হবে আমাদের চলার পাথেয়।

Scanned with CamScanner

সবুজ পাতা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয় ভালোবাসা ছড়াত চারপাশে। চিরন্তন সুগন্ধি মিশ্রিত সে ভালোবাসা, যা কখনো ভোলা যায় না। মরু পরিবেশের রুক্ষতা আর সূর্যের প্রখরতায় কর্কশ হয়ে ওঠা সাহাবিরা তার সংস্পর্শে হয়ে গেলেন এমন কিছু মহৎপ্রাণ, যারা ভালোবাসতে জানে, ভালোবাসা দিতে জানে, যাদের ভালোবাসা প্রভাবিত করে।

তাঁদের মাঝে থাকা হলদে ফ্যাকাশে রংটা মুছে দিলেন তিনি, প্রাণগুলো জেগে উঠল সবুজ পাতার মতো।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেলেন এমন অসংখ্য মানুষ, যারা নিজেদের কন্যা-সন্তানদের জ্যান্ত দাফন করে, কারণ তারা 'মেয়ে'। তারা নারীকে মনে করে কলঙ্ক, অপয়া। এক ভাই অন্য ভাইকে হত্যা করে কেবল একথলে মুদ্রার জন্য।

তিনি নতুন করে গড়ে তুললেন তাদের। ভালোবাসার পরশমণি ও সঞ্জীবনী সুধা দিয়ে। তারা পরিণত হলেন এমন সব মানুষে, বোঝাই যায় না যে, কোনোদিন শত্রুতা ছিল তাদের মাঝে!

এই যে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু; আল্লাহর হকের ব্যাপারে যিনি ছিলেন দৃঢ়। কোনো এক সুন্দর সন্ধ্যায় তিনি চেয়েছিলেন এমন এক বাড়ি, যেটা আবু উবাইদার মতো মানুষে ভর্তি থাকবে!

Scanned with CamScanner

আর আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু; তিনি তার গাল মাটির সাথে মিশিয়ে বিলালকে বলেছিলেন যেন পা দিয়ে তাকে মাড়িয়ে দেয়। আবু যারের অপরাধ—তিনি এমন এক কথা দিয়ে বিলালকে আঘাত করেছিলেন, যা বিলালের মর্যাদার সাথে যায় না। বিলাল তাকে উঠিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

তারপর সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস; হেঁটে যাচ্ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনু আওফের জানাযার সামনে দিয়ে। বিধ্বস্ত শরীরে, ভাঙা মন নিয়ে। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলছিলেন, 'আহ! পাহাড়সম মানুষটা!'

তাদের হৃদয় ভালোবাসাকে চিনতে শুরু করেছিল। যে ভালোবাসা আগে ছিল একটা ভাষা, যার মূল রূপ তাদের জানা ছিল না।

ভালোবাসার শক্তি, যা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছিলেন। আত্মাগুলো নবরূপ পেয়েছিল। ফলে তাতে এসেছিল জীবনীশক্তি, ছড়িয়ে পড়েছিল সুরভি।

আমি জানি না!

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুদাইবিয়া থেকে ফেরার পথে মুসলিমরা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে হতাশ। কেননা, সেই সফরে তারা কেবল পথের ক্লান্তিটুকুই অর্জন করেছে। তারা না পেরেছে উমরাহ করতে, না পেরেছে সম্মানিত কাবা ঘর দেখে চোখ দুটোকে শীতল করতে; বরং তাদের সাথে মুশরিকদের এমন চুক্তি হয়েছে, যার ধারাগুলো শত্রুদের পক্ষেই যায়!

ক্লান্তিভরা এই পথে আসমান থেকে নাজিল হলো সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন—

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ﴿٢٠﴾

.....

আল্লাহ তোমাদের ওয়াদা দিয়েছেন যুদ্ধলব্ধ বিপুল সম্পদের, যা তোমরা হস্তগত করবে।[১]

.....

[১] সুরা ফাতহ, আয়াত : ২০

Scanned with CamScanner

বিপুল এ সম্পদ ছিল আসন্ন খাইবার বিজয়ের। এ বিজয় হুদাইবিয়ার সন্ধি সেরে ফিরে আসা আত্মাগুলোর ক্লান্তি মুছে দিতে পেরেছিল। সাহাবিরা তখনো জানতেন না, হুদাইবিয়ার সন্ধি কীভাবে 'বিজয় ও ক্ষমতা অর্জন' ছিল!

খাইবারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিজয় অর্জন করলেন, তখন খুব একটা কষ্ট ছাড়াই যেন সম্পদ লাভ করলেন। যে সম্পদের পরিমাণ স্বয়ং আল্লাহই বলেছেন!

খাইবার থেকে ফেরার পথে রাসুলুল্লাহর সাথে এক পুরাতন বন্ধু ও প্রিয় ব্যক্তির সাক্ষাৎ, পথেই প্রকাশ পেল গভীর ভালোবাসা। তিনি হলেন জাফর ইবনু আবি তালিব, তার চাচাতো ভাই। দশ বছরের লম্বা বিচ্ছেদের পর দেখা। ইসলামের প্রথম দিনগুলোতে যে কয়েকজন সাথি ছিল, তাদের একজন তিনি। তার সাথে দেখা হওয়ার জন্যে নবি-হৃদয় কাতর। আনুষ্ঠানিক সাক্ষাতের যত নিয়ম আছে সেসব তিনি বাদ দিলেন। উষ্ম আলিঙ্গান করলেন জাফরকে, দুই চোখের মাঝে চুমু খেলেন। যেন বেশ কয়েক বছর জমে থাকা তীব্র ভালোবাসা নিবেদন করছেন তার প্রতি।

তারপর পরিপূর্ণ ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি বললেন, 'আমি জানি না, আমি কী কারণে বেশি খুশি—জাফরের আগমনে, নাকি খাইবার বিজয়ে।'[১]

পুরোনো সাথি ও চাচাতো ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের বিষয়টাকে সেই মহান বিজয়ের সমান করে দেখলেন, যে বিজয়টা ছিল কুরআনের সুসংবাদ!

এমনই ছিল মহান রাসুলের হৃদয়ে বিস্ময়কর ভালোবাসার রূপ!

এরপর কে?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চারপাশের প্রতিটি মানুষকে অনুভব করাতেন যে, তিনি তাকে একটু বেশিই ভালোবাসেন, একটু বেশিই গুরুত্ব দেন। যে-ই আসত, তার দিকে ফিরে তাকাতেন, দেখলেই মুচকি হাসি দিতেন।

এই যে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু। তার সাথে দেখা হলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় মুচকি হাসতেন। দুজন কোনো ঘরে একত্র

---

[১] *মুসতাদরাক লিল হাকিম* : ৪২৪৯

Scanned with CamScanner

হলে, কোনো বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলে ভালোবাসার অনুভূতিটুকু যেন সাদা পাখির মতো ডানা মেলে থাকত। হৃদ্যতা এত বেড়ে যেত যে, আমর সময়ে সময়ে মনে করতেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হয়তো তিনি নিজেই। আমরের জানামতে এতটা ভালোবাসা মানুষ কেবল তার প্রিয়জন বা আপন মানুষের জন্যই জমিয়ে রাখে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ মর্যাদা তাকে দিলেন, তাকে পাঠালেন যাতুস সালাসিল যুদ্ধের নেতৃত্বে। আমর ভাবলেন এই তো সুযোগ সত্য উদঘাটনের। নবিজির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে?'

উত্তর এলো, 'আয়িশা।'

আমর বললেন, 'পুরুষদের মধ্যে?'

তিনি বললেন, 'আয়িশার বাবা।'

আমরের হৃদয়ে যেন ক্ষণিকের নিরাশা। আশার আলো তখনো টিমটিম করে জ্বলছে। তারপরও প্রশ্ন করে গেলেন, 'এরপর?'

তিনি বললেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব।'

আমরের 'এরপর' চলতে লাগল। নাম আসছে, কিন্তু আমরের নাম আসছে না।[১]

নিশ্চয় আমরের নাম সে তালিকায় থাকবে। হয়তো একটু পরে আসবে, কিন্তু আসবে তো নিশ্চিত। এখনো যে নবিজির প্রিয়জনদের নামই বলা শেষ হয়নি!

একবার ভাবুন তো, কী কারণে আমরের মনে হয়েছিল যে, তিনিই নবিজির সবচেয়ে প্রিয়?

এটা কি নবিজির ভালোবাসার অনন্য দিক নয়, যার মাধ্যমে তিনি সবাইকে আপন করে নিতে পেরেছিলেন?

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৪৩৫৮

Scanned with CamScanner

সুমধুর ভালোবাসা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ভালোবাসার আলাদা একটা অর্থ ছিল। তার অভিধানে ভালোবাসা হলো বান্দার রিযিকের এক রূপ। কোনো হৃদয় যদি অন্য হৃদয়ের জন্য শিহরিত হয়, তবে তা এ কারণে যে, আল্লাহ সে হৃদয়কে শিহরিত করতে চেয়েছেন।

খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা মারা যাবার পর তার ব্যাপারে তিনি বলেন, 'তার প্রতি ভালোবাসা ছিল আমার জন্যে আল্লাহর দেওয়া রিযিক।'[১]

তিনি নিজের স্ত্রীদের মাঝে কোনো কিছু বণ্টন করতে গিয়ে সবসময় ইনসাফ করতেন। তবে তার হৃদয়ে আয়িশার প্রতি ছিল এক প্রগাঢ় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা কারো কাছে গোপন নেই।

কোনো মানুষের জন্য হৃদয় কেঁপে ওঠা, কারো প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়া—এটা মানুষের মালিকানায় নেই। তাই নিজ হৃদয়ে আল্লাহর দেওয়া এই দানের বিরোধিতাও তিনি করতেন না; বরং মহান মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ীই তার মন সায় দিত, কোনো প্রকার জুলুম না করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে।

মৃত্যুর আগে যখন অসুস্থ ছিলেন, তখন প্রতি রাতে জিজ্ঞেস করতেন, 'আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব?'

প্রিয়তমা আয়িশার কাছে যেদিন থাকবেন, সেইদিনের প্রত্যাশা করতেন!

এমনই মধুর ছিল আল্লাহপ্রদত্ত সেই ভালোবাসা!

আমি তোমাকে ভালোবাসি

কোনো একদিন, মুয়ায হেঁটে যাচ্ছিলেন শত শত মানুষের মতোই। তিনি জানতেন না যে, কিছুক্ষণ পরই তিনি তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর কথাটি শুনতে যাচ্ছেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে এলেন। তার হাত ধরলেন।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৪৩৫

Scanned with CamScanner

কেমন ছিল সে উষ্ণতা, যা দিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘিরে ফেলেছিলেন মুয়াযকে?

নবিজি বলেছিলেন, 'মুয়ায, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে ভালোবাসি!'[১]

মুয়াযের জীবন যেন থমকে দাঁড়ায়। এমন পরম প্রাপ্তির পর জীবন থেকে কি নিজেকে গুটিয়ে নিতে ইচ্ছে করছিল? স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তাকে ভালোবাসেন!

এই অসাধারণ দামি মুহূর্তের পর জীবনের আর সব যেন তুচ্ছ মনে হয়!

চারিদিক থেকে কী পরিমাণ আনন্দ তাকে ঘিরে ধরেছিল সে সময়টিতে?

তার সামনে কোন রঙের ফুলঝুরি ছড়িয়ে পড়েছিল?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তাকে ভালোবাসেন!

আপনি কি জানেন কেন আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু চাইতেন লোকে তাকে আবু তোরাব (ধুলো-মাটিওয়ালা)[২] বলে ডাকুক!

শুনুন তাহলে আবু তোরাবের গল্প

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন ফাতিমার বাড়ি। আলিকে পেলেন না সেখানে। তিনি বললেন, 'তোমার চাচাতো ভাই কোথায়?'[৩]

ফাতিমা জবাব দিলেন, 'আমার সাথে তার মনোমালিন্য হয়েছে। তিনি আমাকে রাগিয়ে দিয়ে বাইরে চলে গেছেন। বাড়িতে দুপুরে ঘুমাননি আজ।'

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ২২১২৬; *সুনানু আবি দাউদ* : ১৫২৪

[২] আবু শব্দটি সবসময় পিতা অর্থ প্রকাশ করে না। যেমন : আবু হুরায়রা মানে বিড়াল-ওয়ালা।

[৩]এখানে 'চাচাতো ভাই' শব্দটি রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য নিকটাত্মীয়তা বোঝানো। কেননা, আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন নবিজির চাচাতো ভাই, ফাতিমার নন। কিছুক্ষণ পূর্বে তাদের মাঝে যে মনোমালিন্য হয়েছে, সেটার কথা ভুলিয়ে পৈত্রিক আত্মীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই ছিল নবিজির এই বাণীর মর্মকথা।—*ফাতহুল বারি শারহু সহিহিল বুখারি*।

Scanned with CamScanner

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজনকে ডেকে বললেন, 'দেখো তো, সে কোথায়?'

লোকটা ফিরে এসে জানাল তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে এলেন। আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু শুয়ে ছিলেন। পাশ থেকে সরে গিয়েছিল চাদরটা, ধুলোমলিন শরীর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার শরীর থেকে ধুলোবালি মুছে দিয়ে বললেন, 'আবু তোরাব, ওঠো। আবু তোরাব, উঠে পড়ো।'[১]

ভেবে দেখুন, যে মানুষটাকে আল্লাহ জিন-ইনসানের কাছে রাসুল করে পাঠিয়েছেন, যার ওপর সর্বশেষ শরিয়ত নাজিল করেছেন, তিনিই কিনা একজন সাহাবির শরীর থেকে ধুলো মুছে দিচ্ছেন, আর দরদমাখা কণ্ঠে বলে যাচ্ছেন, 'আবু তোরাব, ওঠো!'

তাই তো কারো মুখে এই ডাক শোনাটা হয়ে গেল আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর সবচাইতে প্রিয়।

এ পৃথিবীতে এমন অনেক কিছুই আছে, যা পরিমাপ করা যায় না। তার মধ্যে একটা হলো ভালোবাসা। ভালোবাসা এমন এক অনুভূতি, যা সংখ্যায় গোনা যায় না, ওজনে মাপা যায় না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ যেমন রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন, তেমনি পাঠিয়েছেন ভালোবাসা-সহ। তিনি একবার এক সাহাবিকে বললেন, 'আবু ইয়াযিদ, আমি তোমাকে দুটি কারণে ভালোবাসি। প্রথমত, আত্মীয় হিসেবে। দ্বিতীয়ত, আমার চাচা তোমাকে ভালোবাসেন বলে।'[২]

একবার এক লোক তার কাছে এসে কোনো এক মুসলিম ভাইয়ের প্রতি নিজের ভালোবাসা ব্যক্ত করল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল সে অনুভূতির জন্য অভিনন্দন দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং তাকে আদেশ দিলেন, 'যাও, তাকে গিয়ে বলো।'[৩]

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৪৪১; *সহিহ মুসলিম* : ২৪০৯

[২] *আল মুজামুল কাবির* : ৫১০; ইমাম যাহাবি বলেন, এটি একাধিক মুরসাল সূত্রে বর্ণিত আছে।

[৩] *মুসনাদু আহমাদ* : ১২৪৩০; *সুনানুন নাসায়ি* : ৯৯৩৯

Scanned with CamScanner

ভালোবাসা এমন এক সংস্কৃতি, যা ছড়িয়ে দিতে হয়; এমন এক ভাষা, যা বলে ফেলতে হয়; এমন এক অনুভূতি, যা জীবনে সঞ্চার করতে হয়।

নবিজি যাইদ ইবনু হারিসের প্রতি নিজের ভালোবাসা ব্যক্ত করেছিলেন স্নেহ ও দয়ার্দ্র কণ্ঠে। একদিন তাকে ডেকে বললেন, 'যাইদ, তুমি আমার মাওলা[১]। তুমি আমার আর আমি তোমার। তুমি আমার কাছে এ সম্প্রদায়ের সবচাইতে প্রিয় মানুষ।'[২]

আমি যেন যাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে পাচ্ছি। তিনি নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে হেঁটে যাওয়ার সময় কল্পনা করছেন, সেই মহান মানুষটা তাকে সর্বোচ্চ চূড়ায় স্থান দিয়েছেন, যখন তিনি বলেছেন, 'এ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ!'

শুধু কথার মায়াজালে নয়, তিনি ভালোবাসার মশাল জ্বেলেছিলেন কাজের মাধ্যমেও; যা দেখলে জীবন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সাদ ইবনু মুয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধাহত হয়েছিলেন। মদিনার এই মহান নেতার সুস্থতার প্রত্যাশায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গোটা পরিবেশ।

হঠাৎ কোনো ভূমিকা ছাড়াই জিবরিল আলাইহিস সালাম এসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন সে নেককার বান্দা মারা গেল, যার মৃত্যুতে আসমানের দরজাগুলো খুলে গেল, কেঁপে উঠল আরশ?'[৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্বাক, মনে পড়ে গেল সাদের কথা। ছুটে গেলেন তার তাঁবুতে। ততক্ষণে তার ক্ষতস্থান থেকে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। তাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। রাসুলুল্লাহর পবিত্র চেহারা আর দাড়ি রক্তে লাল হয়ে গেল। মহান মানুষটার চেহারায় তখন যে সুগভীর বেদনার প্রকাশ, তা ছোট-বড় সবাই পড়তে পারে।

এমনই ভয়াবহ মুহূর্তে আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু ঢুকলেন। যা দেখার দেখলেন। আবু বকর বললেন, 'হায়! মৃত্যু সাদকে কাবু করে ফেলল!' তারপর

---

[১] আরবি পরিভাষায় আযাদকৃত দাসকে মাওলা বলা হয়।

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৫৭; *মুসতাদরাক লিল হাকিম* : ৪৬১৪; হাদিসটিকে ইবনু হাজার তার 'ইসাবা'তে হাসান বলেছেন।

[৩] *সুনানুন নাসায়ি* : ২০৫৫; সাদের মৃত্যুতে আরশ কেঁপে ওঠার বিষয়টি *সহিহ বুখারিতে* রয়েছে।

Scanned with CamScanner

ঢুকলেন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনিও যা দেখার দেখলেন। গভীর আবেগ নিয়ে বললেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'[১]

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'মুসলিমদের জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার দুই সাথির পরে সাদ ইবনু মুয়াযের মতো আর কারো মৃত্যুতে মানুষ এত শূন্যতা অনুভব করেনি।'[২]

এই সেই নবি, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম; এই সেই ভালোবাসা, যা তিনি তার সাহাবিদের হৃদয়ে বুনে দিয়েছিলেন। এই সেই সাদ, যার মৃত্যুতে মদিনা নগরী দুলে ওঠে, কেঁপে ওঠে আর-রহমানের আরশ!

জীবন কষ্টক্লেশে পরিপূর্ণ। ভালোবাসা দিয়ে যদি তা আচ্ছাদিত করতে না পারি, তাহলে আমরা চূর্ণ হয়ে যাব। বিলীন হয়ে যাব কিছু বুঝে ওঠার আগেই।

তাই তো তিনি জোর দিলেন ভালোবাসার কথা জানিয়ে দিতে—'যাও। তাকে গিয়ে বলো।' যাতে ভালোবাসার বাণী মদিনা নগরীতে ছায়াদানকারী মেঘ হয়ে থাকে, যাতে সেই মেঘ থেকে ভালোবাসার বৃষ্টি নামে, যাতে মরুভূমির রোদে ক্লান্তক্লিষ্ট হৃদয়গুলোতে জ্বলে ওঠা আগুন নিভে যায়।

এমনকি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরও ভালোবাসা একটা অভ্যাস হয়ে গেল। সবার জানা হয়ে গেল তার ভালোবাসার মাপকাঠি। তাই এখন যে-কেউ বলতে পারে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত থাকলে কোন বিষয়টা পছন্দ করতেন!

ইবনু মাসউদ একবার তাকালেন রাবি ইবনু খুসাইমের দিকে। সেই ইবাদতগুজার ছেলেটা, যে মদিনার পথে পথে হেঁটে বেড়ায় আর চোখে যেন জান্নাত-জাহান্নাম দেখতে পায়! ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, 'আবু ইয়াযিদ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তোমাকে দেখতেন, তাহলে ভালোবেসে ফেলতেন!'

---

[১] *মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবা* : ৩২৯৮৮ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন *ফাযায়িলুস সাহাবিতে*।

[২] *মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবা* : ৩৭৯৫৩; ইবনু সাদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন *ফাযায়িলুস সাহাবিতে*।

Scanned with CamScanner

রাবি ইবনু খুসাইমের আত্মা যে বিনীত! সেই বিনয়, সেই একাগ্রতা, দুনিয়ার প্রতি সেই উদাসীনতা—এসবই তো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দ করেন।

রাবির আত্মা মহান মানুষটার কাছে খুবই প্রিয় হতো হয়তো, যে মানুষটা ভালোবাসার এক আলাদা কানুন দাঁড় করিয়েছিলেন, যা সাহাবিদের বোধগম্য। তিনি কী ভালোবাসতেন, তা সাহাবিদের জানাতেন। তাদের কাছে কোন বিষয়টি পছন্দনীয় হওয়া উচিত তা তিনি বলে দিতেন।

আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা

একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের সাথে নিয়ে বের হলেন। হাঁটছেন কবরের দিকে। সেই অজানা সিন্দুকের দিকে, যেখানে কিছু মানুষ শুয়ে আছে। যে মানুষগুলো একদিন তার পক্ষে লড়েছিল, গ্রহণ করেছিল তার দ্বীন, তার মূলনীতিকে আঁকড়ে ধরেছিল, জীবন দিয়েছিল হকের পক্ষে। তিনি তাদের জন্য বিশেষভাবে দুআ করলেন, সে দুআয় মিশ্রিত ছিল সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা! যে আকাঙ্ক্ষা কবির কথাকে প্রতিধ্বনিত করে, 'আকাঙ্ক্ষা তো তখনই তীব্র হয়, যখন একটা তাঁবু অন্য তাঁবুর কাছাকাছি চলে আসে।'

দুআ শেষে ফিরে তাকালেন সাহাবিদের দিকে। বললেন, 'আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমার ভাইদের একটু দেখি।'[১]

ঘিরে থাকা সাহাবিরা কিছুটা বিস্মিত হলেন। তারা নিজেদেরকে তার ভাই হিসেবেই মনে করতেন। তারা বললেন, 'রাসুলুল্লাহ, আমরা কি আপনার ভাই নই?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'তোমরা তো আমার সাহাবি। আমার ভাই হলো তারা, যারা এখনো (দুনিয়ায়) আসেনি।'

ভাবতে পারেন? আপনার মুখভঙ্গি, আপনার গলার আওয়াজ, সুন্দর কথামালা—এগুলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে চেয়েছিলেন, শুনতে চেয়েছিলেন।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৪৯

Scanned with CamScanner

এই মহান মানুষটির হৃদয়ে কেমন যেন একটা আকুতি ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই কামনার দীর্ঘশ্বাসেই যেন ব্যক্ত হয়েছিল, 'আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমার ভাইদের একটু দেখি।'

গভীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যখন এ কথাটা বলেছিলেন, তখন তার কথার প্রতিটি অক্ষরে যেন দীপ্ত হচ্ছিল অশ্রুর চাইতেও পবিত্র কিছু। তিনি বলেছিলেন, 'আমার উম্মতের মাঝে আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবে ওই মানুষগুলো, যারা আমার পরে আসবে; কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই চাইবে নিজের পরিবার ও সম্পদের বিনিময়ে হলেও আমাকে একটিবার দেখতে।'[১]

আপনার কি কখনো মনে হয়েছে, যে নবি তার দাওয়াত নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত, যিনি তৎকালীন নানান ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে চিন্তিত, নিজ রাষ্ট্রের কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত; সেই তিনিই আপনার প্রতি নিজের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবেন?

সত্যি বলছি! আপনার প্রতিই ছিল সেই আকুলতা! নবিজি তো আপনার প্রতিই আগ্রহী ছিলেন, আকাঙ্ক্ষী ছিলেন! আপনাকেই দেখতে চেয়েছিলেন! বসতে চেয়েছিলেন আপনারই সাথে! আপনার সাথে মেতে উঠতে চেয়েছিলেন ভালোবাসাময় আলোচনায়!

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৪৯

Scanned with CamScanner

ভোলা যায় না!

বিশ্বস্ততা ছাড়া ভালোবাসা পূর্ণতা পায় না। কত মানুষ আছে, যারা ভালোবাসে! খুব কম মানুষই ভালোবাসা ধরে রাখতে পারে, ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষা করতে পারে, ভালোবাসার চারায় মহানুভবতা, ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বস্ততার পানি ঢেলে যেতে পারে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ভালোবাসতেন। তবে তিনি যাকে ভালোবাসতেন তাকে সহজে ভুলতেন না। কারণ, ভালোবাসা যদি কোনো অনুভূতির সূচনা হয়, তাহলে বিশ্বস্ততা হলো তার সমাপ্তি ও স্থায়িত্বের প্রতীক।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়...

আবু বকর সিদ্দিক ও উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুমার মাঝে একবার কথা কাটাকাটি হলো, যেমনটা বন্ধুদের মাঝে হয়ে থাকে। আবু বকর নবিজির কাছে এসে জানালেন সেই মনোমালিন্যের ঘটনা। স্বীকারও করলেন যে, তিনিই প্রথমে কটু কথা বলেছিলেন। লজ্জিত হয়ে ক্ষমাও চেয়েছিলেন, কিন্তু উমার তাকে ক্ষমা করতে নারাজ। সব শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশ্বস্ত করলেন আবু বকরকে; পরপর তিনবার বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন, আবু বকর!'

ততক্ষণে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু অনুতপ্ত হয়ে রওনা দিয়েছেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে। তাকে বাড়িতে না পেয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন।

Scanned with CamScanner

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়ে রাগের অনুভূতি তীব্র হলো। তিনি বললেন, 'তোমরা কি আমার সাথিকে আমার কারণে ছেড়ে দেবে না?'[১]

এ মানুষটা আমার সবচেয়ে কাছের। তার জন্য আমার ভালোবাসা অপরিসীম। আমি যখন মক্কার অলিগলিতে একাকী হাঁটতাম, যখন আমি ছিলাম এমন এক লোক, যাকে সবাই খুঁজে বেড়াত। আমার ধারে-কাছে কেউ ঘেঁষলে তার শাস্তি হতো, মৃত্যুদণ্ড নেমে আসত, বন্দী হতো অথবা নিন্দায় ভেসে যেত। আত্মীয়রা আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে, কিন্তু সে সময়, সেই ঘোর অমানিশার মাঝে এই আবু বকরই আমার সাথি হয়েছিল। আমার হাত থেকে তার হাত আলাদা করতে চায়নি। আবু জাহলের লাঞ্ছনা, আবু লাহাবের কটুকথা, উমাইয়া ইবনু খালাফের প্রভাব, উতবা ইবনু রাবিআর দেওয়া অবর্ণনীয় কষ্ট—এ সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করেছিল সে।

'তোমরা কি আমার সাথিকে আমার কারণে ছেড়ে দেবে না?'

যখন লোকেরা আমাকে মিথ্যুক বলেছিল, তখন সে আমাকে বিশ্বাস করেছিল। যখন সবাই আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন সে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল।

বছরের পর বছর চলে গেলেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভোলেননি সেই পায়ের কথা, যেটা আবু বকর হিজরতের সময় ঢুকিয়েছিলেন বিচ্ছুর গর্তে; যেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীরে বিচ্ছুর কামড় না লাগে! তিনি ভোলেননি মদিনার সেই কষ্টের দিনগুলোর কথা, যখন কুরাইশের তাচ্ছিল্যের চাবুকের মুখে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতেন আবু বকর!

তারপর তার পক্ষ থেকে জবাব দিতেন, তার হয়ে লড়াই করতেন; সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্ব ধরে রেখেই বলতেন, 'যদি তিনি এমনটা বলে থাকেন, তাহলে এটাই সত্য।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই শুভ্র-সফেদ পরিষ্কার ইতিহাস ভোলেননি, তাই আবু বকর ও উমারের মাঝে মতপার্থক্যের দিকটা তিনি ভাবেননি; বরং উমার-সহ সকল সাহাবিকে তিনি তাকাতে বলেছেন অতীতের দিকে, তার ভালো কাজের দিকে। আর আহ্বান করেছেন পারস্পরিক ভালোবাসার দিকে।

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৩৬১১

Scanned with CamScanner

উমার, তোমার সাথে আবু বকরের 'সমস্যা' হয়েছে, তাতে কী? তুমি কি আবু বকরকে ভুলে গেছ? তুমি কি ভুলে গেলে আবু বকর কে? তুমি কি সে দিনগুলো ভুলে গেছ, যে সময় ইসলামের খাতায় শুধু আবু বকরের নামটা ছিল? সকল সমস্যা মুছে যাক, সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে যাক। কেবল থাকুক আবু বকর। সে-ই প্রথম, সে-ই দ্বিতীয়, সে-ই তৃতীয়!

শোকের ছায়া

শেষ বিদায়ের মুহূর্তে প্রকাশিত হয় বিশ্বস্ততার নমুনা। যখন এক বন্ধু ছেড়ে যায় অপর বন্ধুকে, ভালোবাসার মানুষটার রুহ বেরিয়ে যায়; মনটা অস্থির হয়ে ওঠে এই ভেবে যে, সেই প্রিয় মানুষের সাথে আর এই পৃথিবীতে দেখা হবে না।

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, জাফরের মৃত্যুর সংবাদ যখন এলো, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় শোকের ছায়া দেখতে পেলাম![১]

জাফর, যিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই। হাবশা থেকে যার প্রত্যাবর্তনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনন্দ ছিল খাইবার বিজয়ের মতো; সেই মানুষটার মৃত্যুর খবর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়ে কেমন প্রভাব ফেলবে? কী করে তিনি এমন হৃদয়বিদারক ঘটনায় চোখের পানি ধরে রাখতে পারবেন? দুঃখ না করে থাকতে পারবেন? হারানোর বেদনায় দগ্ধ হবেন না?

পাহাড়ের পাদদেশ

হামজা, যে সিংহ ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে আল্লাহর ইচ্ছায় দুর্বল মুসলিমরা হয়ে গেলেন শক্তিধর ও দাপুটে। একজন বিশ্বস্ত সাথি তার বিচ্ছেদে কেমন অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেন?

নবিজি হাঁটছিলেন উহুদের যুদ্ধে শহিদদের মাঝে। হৃদয়ের গভীরতম স্তরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে অবিরত। পড়ে থাকা জনতার মাঝে দেখা মিলল প্রিয় হামজার। নিস্তব্ধ নীরবতায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো। পা দুটো এগিয়ে চলেছে শৈশবের বন্ধুর দিকে।

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৬৩৬৩

Scanned with CamScanner

যখন পবিত্র দেহটির সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন 'ওয়াহশি' তার কী অবস্থা করেছে, তখন আর্তনাদ করে উঠলেন।

বন্য লোকগুলো যা করেছে, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মহান মানুষটি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও শান্ত থাকতে পারেননি।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে প্রবেশ করলেন মদিনায়। আনসার নারীরা তখন প্রিয়জন হারানোর বেদনায় কাতর। তার মনে পড়ল হামজার কথা। মনে পড়ে গেল আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা। মনে পড়ে গেল সেই উজ্জ্বল ইতিহাস ও সুন্দর স্মৃতি। মনে পড়ে গেল তার রাশভারী কণ্ঠ। মনে পড়ে গেল তার সাহসিকতা, তার নির্ভীকতা। মনে পড়ে গেল তার সাহচর্যে অনুভূত উষ্ণতা। অথচ তার জন্য তো কেউ কাঁদছে না! যেন এক টুকরো আফসোস, যেন বিরহের এক ঝাপ্টা তাকে স্পর্শ করল। তিনি বললেন, 'কিন্তু হামজার জন্য কাঁদার তো কেউ নেই!'[১][২]

দিন চলে যায়, রাত কেটে যায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানসপটে ভেসে ওঠে সেই আলোকিত মুখগুলো। যারা উহুদ পাহাড়ের সন্নিকটে শহিদ হয়েছিল। হামজা-সহ আগের সাথিদের কথা মনে পড়ে। এক চিরন্তন অনুতাপের সুরে তিনি বলে ওঠেন, 'আল্লাহর কসম! আমার মন চায়, আমি যদি পাহাড়ের পাদদেশের সেই সাথিদের সাথে চলে যেতে পারতাম!'[৩]

তিনি চাইছেন প্রিয়জনদের সাথেই মারা যেতে। তিনি কামনা করছেন যদি হামজার সাথেই তিনি শহিদ হতে পারতেন!

ইয়া আল্লাহ, এটা 'হালা'ই হবে!

জীবন মানেই তো বিচ্ছেদ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে হারিয়েছেন, খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ রাযিয়াল্লাহু আনহা। সেই মহীয়সী নারী, যিনি তার প্রিয়তমের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন। অর্থ, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা দিয়ে নবিজিকে সহায়তা করেছেন। চরম বিপদের মুহূর্তেও সঙ্গী হয়েছেন তার।

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ৪৯৮৪

[২] এর পরপরই নারীরা কাঁদা শুরু করলে রাসুলুল্লাহ কারো জন্যে বিলাপ করে কাঁদা নিষেধ করেন।

[৩] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৫০২৬

Scanned with CamScanner

দুঃখটা হারানোর মাঝে না। দুঃখ হয় হারিয়ে ফেলার পর ক্ষতগুলো যখন শুকিয়ে যায়, আত্মাগুলো খুঁটিনাটি সব ভুলতে শুরু করে। তারপর হঠাৎ করে কখনো সেই চলে যাওয়া মানুষটাই যদি তার সর্বস্ব নিয়ে হাজির হয়, ফিরে আসে তার স্বর নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে; তখন কেমন লাগবে!

খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদের বোন হালা বিনতু খুওয়াইলিদ একবার মদিনা নগরীতে এলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র নিয়ে ব্যস্ত। সে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ঘটনায় অংশগ্রহণ, বিবিধ যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান—এসবে তিনি মশগুল। খাদিজার স্মৃতির তীব্রতা কিছুটা যেন ম্রিয়মাণ হয়ে এসেছে, হঠাৎ 'হালা'র আগমন। এসেই প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন খাদিজার কণ্ঠ শুনতে পেলেন। তার মনে পড়ে গেল সেই কণ্ঠ, সেই স্মৃতি। আবেগে কেঁপে উঠে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ, এটা 'হালা'ই হবে!'[১]

তিনি চাইছিলেন সে আওয়াজটা যেন খাদিজার বোন হালারই হয়! তিনি যেন মনের মাঝে থাকা সেই স্মৃতির দালান মেরামত করতে চাইছিলেন। চাইছিলেন প্রিয়তমার বোনকে সম্মান দিতে। খাদিজার বিচ্ছেদের সাথে যে অতীত মুছে গেছে, বোনের খোঁজ-খবর নিয়ে তার কিছুটা হলেও ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন যেন।

কী বিরল ভালোবাসার নমুনা! প্রিয়তমার উষ্ণ আওয়াজও ভুলতে পারেননি এই মহান মানুষটা। তাই তো কোনো এক নারীর কণ্ঠ শুনে কেঁপে উঠেছিল হৃদয়, মনে পড়ে গিয়েছিল সুখময় দিনগুলির কথা!

বর্শার আঘাত

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ এক মানুষ। যে মানুষগুলো তাকে ভালোবাসায় আচ্ছাদিত করেছিল, তাকে অনুসরণ করেছিল, তার সাথে থেকে জিহাদ করেছিল, তার পক্ষে লড়াই করেছিল; তিনি তাদের ভুলে যাননি।

সে মানুষগুলোকে আমরা সাহাবি বলি। সেই মহান মানুষটার সাহচর্যে ধন্য হয়েছিলেন তারা। সুখ-দুখে তার সঙ্গী হয়েছিলেন। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে সমুন্নত করেছেন। তাঁর কালিমাকে উচ্চারিত করিয়েছেন সর্বব্যাপী। তাই

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ২৮৮৮; *সহিহ মুসলিম* : ২৫১৩

Scanned with CamScanner

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ভোলেননি; বরং তাদের মর্যাদার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। তারা যে সম্মান ও ভালোবাসা পাওয়ার অধিক উপযুক্ত, তা সাব্যস্ত করেছেন।

যেন আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, একদল আগাছা পরের যুগে এসে মুয়াবিয়াকে গালি দেবে, খালিদকে ছোট করবে, আয়িশার মর্যাদাহানি করবে, উমারের ইনসাফ নিয়ে প্রশ্ন তুলবে, আবু হুরায়রার দ্বীনদারিকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে! রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

সাহাবিদের ব্যাপারে বিশ্বস্ততার উত্তম দৃষ্টান্ত রেখে তিনি বলেছেন, 'আমার সাহাবিদের তোমরা গালি দিয়ো না!'[১]

শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র জন্য বর্শার যে আঘাত তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে, তা কি যথেষ্ট নয়? কেবল এই দ্বীনের জন্য তারা যে হৃদয়ে শত গ্লানি মেখে হিজরত করেছিলেন তা কি যথেষ্ট হয়নি? এখন কোথাকার কে গদিতে হেলান দিয়ে ওহি লেখকের ব্যাপারে মন্দ কথা বলে; সিদ্দিকা বিনতু সিদ্দিক[২] সম্পর্কে মন্তব্য করে বসে!

তারপর তিনি আরও বলেছেন, 'আমাকে আমার সাহাবিদের মাঝে সংরক্ষণ করো।'[৩]

সেই বিশ্বস্ত মহামানব তার প্রিয় সাহাবিদের মর্যাদাকে তার মর্যাদা সংরক্ষণের সমতুল্য করে দিয়েছেন। তাদেরকে সম্মান করা তাকে সম্মান করার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এটা কী করে সম্ভব যে, আপনি যার কাছে দ্বীনের শিক্ষা করছেন তাকে সম্মান করেন না! যে ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত ও সুন্নাহ আপনার কাছে বর্ণনা করছেন, তাকে মিথ্যাবাদী বলছেন!

যে মানুষগুলো এখনো নিফাকি থেকে মুক্তি পায়নি, কটু কথা বলে চলেছে সাহাবিদের নামে; তাদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি যেন সাহাবিদের আড়াল করে বলছেন, 'আমার সাহাবিদেরকে আমার কারণে ছেড়ে দাও।'[৪]

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৫৪০

[২] আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা

[৩] *মুজামু ইবনু আসাকির* : ৬৭

[৪] *মুসনাদু বাযযার* : ৭২২১; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৩৮১২

Scanned with CamScanner

যেন বলতে চেয়েছেন—তাদের ছেড়ে দাও আমার জন্য। আমিই তাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়। তোমরা ফিরে যাও তোমাদের মিথ্যাচার, ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার জগতে।

সাহাবিদের প্রতি কী বিরল আস্থার ছাপ রেখে গেছেন তিনি!

মহত্ত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কৃতজ্ঞতাবোধ কেবল তার সাহাবি আর প্রিয়জনদের জন্যই ছিল না। যাদের সাথে সবচেয়ে সুখের দিনগুলো কেটেছে, সুন্দর স্মৃতিগুলো যাদের সাথে জড়িত, কেবল তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

যারা তার দ্বীনকে অবিশ্বাস করা সত্ত্বেও, তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও ব্যক্তিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল, তিনি তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করেছিলেন। বজায় রেখেছিলেন পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা।

বদরের যুদ্ধে যারা বন্দী তাদের হাজির করা হয়েছে। এরা মক্কা থেকে বের হয়েছে দ্বীনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য, নতুন বার্তাকে বিনষ্ট করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, হকের পতাকা ধূলিসাৎ করার ইচ্ছা নিয়ে। তখন তার মনে পড়ে গেল সে মুতয়িম ইবনু আদির কথা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তায়িফ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে একাকী ফিরে আসেন, তখন যে মানুষটা তার জালিম সম্প্রদায়ের বিপরীতে মাথা উঁচু করে ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি হলেন এই মুতয়িম। নিজ হাতে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন অন্যায় অঙ্গীকারনামা। এই বন্দী মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ে গেল সে কথা। তিনি মুতয়িমের ছেলে যুবাইরকে বললেন, 'যদি তোমার বাবা বেঁচে থাকতেন, আর এদের ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করতেন; তাহলে আমি এদের মুক্ত করে দিতাম।'

এ যে সেই মহত্ত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা, সেই ব্যক্তিত্বের অবদানকে স্মরণ করা! যে মানুষটা কুফরির ওপর মারা গেছে, তার উত্তম কাজও অস্বীকার না করা!

এবার বলুন তো, এই মহান মানুষটার জীবনীতে কোথাও কি মহত্ত্ব ছাড়া আর কিছু আছে? তার ব্যক্তিত্বের এমন কোনো প্রান্ত আছে, যাতে তার বিশ্বস্ততার সুগন্ধি ছড়িয়ে নেই? এ বিশ্বজগতে এমন কোনো মানুষ আছে যাকে বিশ্বস্ততা এতটা মহৎ করে তুলতে পারে, যতটা করেছিল সর্বোত্তম, সবচেয়ে পবিত্র ও মহান মানুষটিকে? আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য পবিত্রতম সালাত ও সালাম পেশ করি।

Scanned with CamScanner

তীব্র সংকট

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সাহসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তার দুটি চোখ সাহাবিদের শেখাত সাহসিকতা ও বীরত্ব।

এমনকি কাফির নেতৃবৃন্দ তার সাথে সংঘর্ষ দীর্ঘতর হওয়াকে ভয় করত, এড়িয়ে চলত সবসময়। তারা জানত তাদের প্ররোচনায় কোন সিংহের উত্থান ঘটবে, কোন সে তরবারির ভূমিকায় মোড় নেবে যুদ্ধের পরিণতি!

কথায়, মতে, যুদ্ধে, অবস্থানে—তার সাহসিকতার ছাপ সর্বত্র। এমনকি তার সহনশীলতা আর বিনয়েও ছিল নির্ভীকতার আভাস। তার ব্যাপারে তারই স্রষ্টা সুবহানাহু তাআলা বলেছেন, 'আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।'[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের যে দরজা দিয়েই আপনি প্রবেশ করুন না কেন, সবখানেই তার সাহসিকতার পরিচয় মিলবে। অসংখ্য স্মৃতিতে ভরপুর তার মহান জীবনের শেষ স্বাক্ষরটা যেন ওই সাহসিকতারই।

তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন নির্ভীক হৃদয়ের অধিকারী এক মানব। দুর্বিষহ ঘটনা তাকে বিচলিত করেনি, জটিলতম অবস্থা তাকে ভীত করেনি। যেন

---

[১] সুরা কলম, আয়াত : ৪

Scanned with CamScanner

এক অটল পর্বত, কোনো অনিষ্ট যাকে স্পর্শ করতে পারে না।

মক্কার রাস্তায় একদিন হেঁটে চলেছেন তিনি। দেখা হয়ে গেল উবাই ইবনু খালাফের সাথে। সে কাফিরদের একজন সর্দার ছিল, মানুষের মনে ত্রাস সৃষ্টিকারীদের একজন। একে তো কুফরে লিপ্ত, তার ওপর হীন চরিত্র।

এই নিকৃষ্ট চরিত্রের লোকটা নবিজির সামনে এসে একটা হাড় গুঁড়ো করে ফেলল। তারপর বেশ অহংকারের সাথে বলল, 'তোমার কি মনে হয়, তোমার রব এই চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়টা আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন?'

সবার দৃষ্টি চলে গেল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে; সবাই যাকে সমঝে চলে, সেই বৃদ্ধ উবাইয়ের প্রশ্নের উত্তর নবিজি কীভাবে দেন তা দেখতে। তিনি উবাইয়ের অবস্থান ও মর্যাদার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সরাসরি বলে দিলেন, 'হ্যাঁ, আর তোমাকেও পুনরুত্থিত করবেন, প্রবেশ করাবেন জাহান্নামে।'

নবিজি ওই এক কথায় যেন কাফিরের নাক ধুলোয় মলিন করে দিলেন, মিশিয়ে দিলেন মাটির সাথে। যে অহংকারী হাশরের দিনে বিশ্বাস করে না, তার অত্যুচ্চ সামাজিক মর্যাদাও নবিজিকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি।

সীরাতপ্রণেতা ব্যক্তিরা বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো একদিন কাবাঘর তাওয়াফ করছিলেন। বিদ্রুপকারীরা এগিয়ে যায় তার দিকে। একজন তাকে খোঁচা দেয় তো অন্যজন হাসাহাসি করে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথারীতি সবকিছু সহ্য করে চলেছেন। না শোনা আর না দেখার ভান করে আছেন। কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল তারা। উত্তর দিতে দেরি করাটা সহনশীলতার তুলনায় ভীতির পর্যায়ে নেমে এসেছিল বোধহয়। নবিজি দাঁড়িয়ে গেলেন সবার সামনে। নীরব হয়ে গেল সবাই। এবার তিনি এমন কিছু শব্দ উচ্চারণ করলেন, যা শুনে তাদের হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের প্রাণহরণের বার্তা নিয়ে এসেছি আমি।'

কেবল এই একটি বাক্যেই বিদ্রুপকারীদের অন্তরে এমন ভয়ের সঞ্চার হলো যে, তারা ছুটে গিয়ে ক্ষমা চাইল নবিজির কাছে। কিন্তু নবিজি তখন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি, বরং নিজ সহনশীলতার গুণে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন।

Scanned with CamScanner

অবিশ্বাসী হলেও তারা ভালো করেই জানত, তিনি যা বলেন সব যথার্থই বলেন। তাই নবিজি যখন বলেছেন, 'তোমাদের প্রাণহরণের বার্তা নিয়ে এসেছি'—তার মানে নির্ঘাত তাদের কতল করা হবে। এটা ছিল নবিজির ভবিষ্যদ্বাণী। আর বদর যুদ্ধের দিন ঠিক তা-ই ঘটেছিল!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শেখালেন, সাহসিকতা কেবল মুখের কথা না, কেবল হুমকি-ধামকি না, যেটা বাস্তবে পরিণত করা যায় না। সাহসিকতা হলো নিজেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সংবরণ করা। তারপরও শত্রু যদি নিজের বাতিল মতবাদকে নিজেই ধ্বংস করতে চায়, কথা বলার সময় ঘনিয়ে আসে; তাহলে এমন একটা কথা বলে দেওয়া, যার মাধ্যমে সে বুঝতে পারবে যে, আপনি আপনার কথা পুরোপুরি মন থেকেই বলছেন। আপনি তাকে হুমকি দিচ্ছেন কেবল নিজের পরিকল্পনা পেশের মাধ্যমে নয়; বরং ভবিষ্যতে আপনি কী করবেন সে ব্যাপারেও স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার মাধ্যমে।

ভয় পেয়ো না

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈন্যবাহিনীর পেছনে লুকিয়ে থাকতেন না, অশ্বারোহীদের আড়ালে দাঁড়াতেন না কখনো; বরং সামনেই অবস্থান নিতেন।

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার মদিনার কোনো এক প্রান্ত থেকে অদ্ভুত এক আওয়াজ ভেসে আসে। তখন চারদিকের মুশরিক গোত্রসমূহ, কঠোর-স্বভাব আরব বেদুইনদের মাঝে মদিনা নগরী ছিল আলোর উৎস। মদিনাকে কেন্দ্র করে মক্কা, তায়িফ, রোম, পারস্য—সব দিক থেকে হুমকি আসত। মদিনার জীবনটা ছিল যেকোনো রকমের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত।

লোকেরা সম্ভবত ভেবে বসেছিল, এটা মদিনা দখল করতে আসা একদল অশ্বারোহীর আওয়াজ। এরা হয়তো একে অপরকে উৎসাহিত করছে। তাই অনেকে ভয় পেয়ে গেল। অশ্বারোহীরা একে অপরকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। লোকে যা শুনল, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তা-ই শুনেছিলেন। তবে অন্যদের মতো চুপ করে বসে থাকেননি। ছুটে গেলেন আবু তালহার একটা ঘোড়ার দিকে। জিন[১]-বিহীন সেই ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। ঝড়ের বেগে ছুটে গেলেন আওয়াজের

[১] ঘোড়ার পিঠের ওপর বসানো চামড়ার গদি।

Scanned with CamScanner

উৎসের দিকে। খুঁজে বেড়াতে লাগলেন নতুন আগন্তুকদের। তার মাঝে তখন অশ্বারোহীর অদম্য সাহসিকতা।

তার হৃদয় ছিল সাহসী, অন্তর ছিল বীরত্বে পরিপূর্ণ। তিনি দীপ্তি ছড়াচ্ছিলেন সর্বত্র।

এ সময় মদিনার বেশ কয়েকজন অশ্বারোহী জড়ো হয়ে ছুটলেন আওয়াজের উৎসের দিকে। পথিমধ্যে তারা দেখতে পেল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উজ্জ্বল চেহারায় ফিরে আসছেন। অনুসন্ধান শেষে হাসিমুখে বলছেন, 'ভয় পেয়ো না! ভয় পেয়ো না!'[১]

মদিনা নগরী নিয়ে ভয় নেই, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো সেখানে আছেনই। এমনকি মদিনার দুর্ধর্ষ অশ্বারোহীদেরও প্রয়োজন নবিজিকে; যাতে ভীতিপ্রদ মুহূর্তে তাদের হয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন তিনি।

আবু তালহার ঘোড়ায় সওয়ার বাবরি চুলের নবিজি যেন সূচনা করতে যাচ্ছেন বীরত্বের এক নতুন অধ্যায়! মানবীয় শ্রেষ্ঠত্ব বলে একটা কিছু আল্লাহ তার মাঝেই দিয়েছেন, তাকেই দিয়েছেন বার্তা প্রচারের দায়িত্ব। তাই তো তিনি এক গ্রহের মাঝে আবির্ভূত হয়ে উজ্জ্বল কিরণ ছড়িয়ে দিচ্ছেন, যা সেই গ্রহটাও বুঝতে পারে না।

তীব্র সংকট

সাহাবিদের মাঝে সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য সুপরিচিত ছিলেন আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু। বদর যুদ্ধের দিন তিনজন অশ্বারোহীর মাঝে তিনি একজন। কুরাইশদের শক্তিশালী ঘোড়সওয়ারকে পরাভূত করে মাথা শরীর থেকে আলাদা করে দিয়েছিলেন তিনি। তখনো তার মাঝে তারুণ্যের উদ্দীপনা।

সেই উন্মোচিত তরবারিই[২] বলছেন, 'আমরা যখন তীব্র সংকটের মুখে পড়তাম, যুদ্ধক্ষেত্রে এক পক্ষ অপর পক্ষের সাথে মিলিত হতো; তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আড়ালে আশ্রয় নিতাম।'[৩]

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ২৯০৭; *সহিহ মুসলিম* : ২৩০৭

[২] এখানে উন্মোচিত তরবারি বলতে আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বোঝানো হচ্ছে।

[৩] *মুসনাদু আহমাদ* : ১০৪২

Scanned with CamScanner

তীব্র সংকট কেমন হয় তা কি আপনি কল্পনা করেছেন?

কেমন রক্তবর্ণ ধারণ করে সে সময়?

যখন গলা থেকে গলগল করে রক্ত প্রবাহিত হয়। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ছিন্নভিন্ন দেহ।

সেই চূড়ান্ত মুহূর্তে আলি ইবনু আবি তালিব, তালহা, যুবাইর, হামজা, আবু দুজানা—এদের সবার সাহসিকতা তুচ্ছ হয়ে পড়ে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বীরত্বের সামনে!

রাসুলুল্লাহর আড়ালে আশ্রয় নিতেন তারা। তাদের ও মৃত্যুর মাঝে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে রাখতেন নবিজিকে। তরবারির পারস্পরিক আঘাতের মাঝে থাকতেন তিনি।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক সময়ে সাহসের প্রতীক ছিলেন, যখন সাহসিকতা ছিল মিথ্যে স্রষ্টার মতো এক মূর্তি, সবাই যার উপাসনা করে। তিনি এসে সাহসী মস্তক অবনত করে পরিণত হলেন মহান স্রষ্টার প্রতি ইবাদত-রত এক বিনয়ী বান্দায়।

এবার যুদ্ধ হবে

ভয়াবহ বিপদের সময়ই প্রকাশিত হয় সাহসিকতার প্রকৃত রূপ। সবচেয়ে বেশি সাহসের মুহূর্ত হলো যখন বর্শাগুলো পরস্পরকে আঘাত করে, তরবারি বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। তখনই প্রকাশ পায় হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা, বীরত্বের নানান ভঙ্গিমা। এমন স্থানে অটল তো কেবল সে-ই থাকতে পারে, যার হৃদয়ে সাহসিকতার রক্তাক্ত মোহর লাগানো থাকে!

হুনাইনের যুদ্ধের কথা কুরআনুল কারিমে আছে। মহামহিম আল্লাহ বলেন—

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾

আর হুনাইনের দিন, যেদিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উল্লসিত করেছিল; অতঃপর তা তোমাদের কাজে আসেনি, পৃথিবী তার সমস্ত প্রশস্ততা সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল, তোমরা পশ্চাদ্ধাবন করেছিলে।[১]

[১] সুরা তাওবা, আয়াত : ২৫

Scanned with CamScanner

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল ১২ হাজার। ইসলামি বাহিনী ইতঃপূর্বে এত পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ করতে পারেনি। কিছু মুসলিম তো গর্বভরে বলেই ফেলেছিলেন, 'আজ আর আমরা সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে হেরে যাবার ভয় করব না।'

যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়পক্ষ মুখোমুখি হলো। হাওয়াযিনের তরবারি, সাকিফের[১] বর্শাগুলো নিশ্চিত মৃত্যু নিয়ে এলো। মুসলিমদের বিন্যস্ত সারি বিশৃঙ্খলায় রূপ নিল। উপত্যকার সবাই পালাতে শুরু করল!

এমনকি সর্বাধিক সাহসী সাহাবিগণ, যারা সবচেয়ে বেশি উদ্যমী ও উৎসাহী; তারাও পিছু হটলেন—আল্লাহ যেমন বলেছেন, 'পশ্চাদ্ধাবন করল।' ইস্পাতের মতো দৃঢ় সে হৃদয়গুলোতে এই অকস্মাৎ ভীতি অবতীর্ণ করার পেছনে আল্লাহর রয়েছে এক বিশেষ প্রজ্ঞা!

এই ভয়াবহ সময়টাতে কোথায় ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম?

সীরাত-প্রণেতারা বলেন, এই মৃত্যুপুরীতে দাঁড়িয়ে তীব্র যুদ্ধের মুহূর্তে চিৎকার করে তিনি বলছিলেন, 'হে আদম-সন্তানেরা, আমার দিকে এসো। আমি আল্লাহর রাসুল। আমি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ!'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুকে পিঠ দেখাননি; বরং আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রেখেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছেন। এই মানুষটিই বলেছিলেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি—আমার ইচ্ছে করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে একবার শহিদ হই, এরপর আবার জীবিত হই। তারপর আবার শহিদ হই, আবার জীবিত হই। তারপর আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই। তারপর আবার শহীদ হয়ে আবারও জীবিত হই। তারপর আবার শহীদ।'[২]

যে মানুষটির হৃদয়ের আকুতি মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া, তার কাছে মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখা কি কোনো গুরুতর বিষয় হতে পারে?

---

[১] হাওয়াযিন ও সাকিফ হচ্ছে আরবের শক্তিশালী দুটি গোত্র। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যরা তাদের মুখোমুখি হয়েছিল।

[২] *সহিহ বুখারি* : ৩৬

Scanned with CamScanner

সেদিন হুনাইনের যুদ্ধে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু চিৎকার করে বলেছিলেন, 'কোথায় ওরা, যারা গাছের নিচে বাইয়াত নিয়েছিল? কোথায় আনসার সাহাবিরা? কোথায় হারিস ইবনুল খাযরাজের বংশধরেরা?'

এ আহ্বানে তাদের হৃদয়ে আবার সাহসিকতা জন্ম নেয়। তারা ফিরে আসেন যুদ্ধক্ষেত্রে। যেন চোখের সামনে জান্নাত দেখতে পাচ্ছিলেন তারা। আব্বাস বলেন, 'আল্লাহর কসম! তারা যখন আমার আওয়াজ শুনল, তখন তারা ঠিক সেভাবে সাড়া দিলো, যেভাবে গাভী তার বাছুরের ডাকে সাড়া দেয়।' তারা বলতে লাগল, 'লাব্বাইক, লাব্বাইক!' সাকিফ-হাওয়াযিন কিংবা মৃত্যু-ভয় কোনো কিছুই তখন সেই অনুভূতিকে পরাজিত করতে পারবে না, যে অনুভূতি ভর করেছিল প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথিদের ওপর।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দেখতে পেলেন যুদ্ধ তীব্র মাত্রায় রূপ নিয়েছে, চারিদিকে ধুলো ছড়িয়ে চিত্রপট পাল্টে যাচ্ছে, তখন বললেন, 'এবার যুদ্ধ হবে!'

এমন যুদ্ধ শুরু করলেন তিনি, যার কোনো তুলনা হয় না। এমন সাহসিকতা প্রদর্শন করলেন তিনি, যা অনন্য। শুরু হলো এমন আঘাত, যা মাথাকে আলাদা করে দেয় দেহ থেকে। যারা সন্তুষ্টির বাইয়াত নিয়েছিলেন, তাদের সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল। সমাপ্তি ঘনিয়ে এলো শিরকের উপাখ্যানের। অপরাজেয় বাহিনী বলে যে ভ্রম সৃষ্টি হয়েছিল, তা প্রমাণিত হলো মিথ্যায়! নিকৃষ্ট লোকগুলো পালিয়ে গেল নাখলা, তায়িফ আর আওতাসের দিকে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পাকড়াও করতে শুরু করলেন তার বাহিনী নিয়ে। তাদের চেহারাগুলো ধুলোমলিন হয়ে গেল, ছেয়ে গেল কালিমায়!

তিনি যে মুহাম্মাদ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সবচেয়ে সাহসী মানুষ। তাই সাহসিকতা নিয়ে কথা বলতে গেলে তার নাম উল্লেখ না করে পারবেন না আপনি। বীরত্বের ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে তার যুদ্ধযাত্রাগুলো—বদর, উহুদ, খন্দক, মক্কা বিজয়, হুনাইন বিজয়—এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব!

Scanned with CamScanner

পবিত্রতম অংশ

ধরুন, কোনো সাহসী ব্যক্তির জীবনী পড়ছেন, যিনি তার শত্রুর মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন, শত্রুর স্বপ্নেও দুশ্চিন্তার বসতি গেড়েছেন, যার হৃদয়ে করাঘাত করে না ভয়ের বার্তা, কাপুরুষতার স্পন্দন যার অভিধান-বহির্ভূত; এ মানুষটিকেই যখন আবার দেখলেন দয়ালু, শিশুর মৃত্যুতে ব্যথিত, যার আশা ঝলসে যাওয়ায় চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত, যিনি সবচেয়ে বড় শত্রুর জন্যও আফসোস করেন—কল্পনা করতে কষ্ট হবে বৈকি!

আপনার উচিত প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী পড়া, যাতে সেই অনন্য মানুষটিকে চিনতে পারেন; যিনি সাহসিকতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেও দয়া ও মমতার সর্বোৎকৃষ্ট অর্থ ধারণ করতে পেরেছিলেন।

তার আগমনের কারণ তো সীমাবদ্ধ 'রহমতে'; তিনি যেন আপাদমস্তক রহমতে গড়া। আল্লাহ তার ব্যাপারে বলেন—

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

আমি আপনাকে কেবল সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।[১]

[১] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭

Scanned with CamScanner

কেবল স্ত্রী-সন্তান-প্রতিবেশীর জন্য না, সাহাবিদের জন্যও না; বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন তিনি! আল্লাহ ছাড়া আর যা কিছু আছে, সবই তো এই সৃষ্টিজগতের অন্তর্ভুক্ত।

ওর ছানা ওকে ফিরিয়ে দাও

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাহাবিরা একটি সফরে ছিলেন। এ সময় তারা 'হুম্মারা' নামক একটি পাখি পেলেন। সাথে ছিল দুটি ছানা। পাখির ছানা দুটোকে সাহাবিরা নিলেন। ফলে মা পাখিটা ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় ডানা ঝাপ্টাতে লাগল।

তারা আসলে এমনটা করেছিলেন নিছক বিনোদনের উদ্দেশ্যেই। সুন্দর ছানাগুলো দেখছিলেন, ধরছিলেন, সেগুলোর আওয়াজ শুনছিলেন। দুখিনী মা পাখিটিকে নিয়ে তাদের ভাবনা ছিল না। কিন্তু রহমতের নবি এসে পড়লেন; যার হৃদয় চারদিকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কষ্টের অনুভূতিও অনুভব করতে পারে। তিনি যেন এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রেরিত। যেন এসেছেন আর্তনাদ থামাতে, অশ্রু মুছে দিতে। তাই ছানাদের জন্য আর্তচিৎকার করতে থাকা মা পাখিকে দেখে তার আনন্দ লাগল না! ব্যাপারটা এখন আহত মাতৃ-হৃদয়ের সাথে জড়িত, দ্রুত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই অনমনীয় স্বরে বললেন, 'কে এই মা পাখিকে বাচ্চার ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে? ওর ছানা ওকে ফিরিয়ে দাও।'

সাহাবিগণ নবিজির আদেশ দ্রুত বাস্তবায়ন করলেন। মা পাখির অন্তরে প্রশান্তি ফিরে এলো। শান্ত হলো নবিজির রহমতপূর্ণ হৃদয়।

জেনে রাখো, আবু মাসউদ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেঁটে যাচ্ছেন মদিনার গলিতে। তার কানে ভেসে এলো চাবুকাঘাতের আওয়াজ!

সাহাবি আবু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এক দাসকে প্রহার করছেন। সে প্রহার নিপীড়িত দাসের পিঠকে যতটা ব্যথিত করছে, তার চেয়ে বেশি ব্যথিত করছে দয়ালু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তর। রহমতের নবি ভাঙা হৃদয়ে বললেন, 'জেনে রাখো, আবু মাসউদ!'

Scanned with CamScanner

প্রচণ্ড রাগে আবু মাসউদ কণ্ঠটা চিনে উঠতে পারেননি। নবিজি কাছে এসে আবার বললেন, 'জেনে রাখো, আবু মাসউদ!'

আবু মাসউদ নবিজির আওয়াজ শুনে কেঁপে উঠলেন। তাকালেন তার দিকে। জুলুমের আঘাতে তখনো হাত কলুষিত। তার পেছন থেকে নবিজি বলছেন, 'আবু মাসউদ, জেনে রাখো, তুমি তার ব্যাপারে যতটুকু ক্ষমতা রাখো, আল্লাহ তোমার ব্যাপারে তার চাইতেও বেশি ক্ষমতা রাখেন!'

আবু মাসউদের হাত থেকে চাবুক পড়ে যায়। তার হৃদয় গলে যায়, থমকে যায় কণ্ঠস্বর।

আবু মাসউদ দাসকে বলেন, 'যাও, আল্লাহর জন্য তোমাকে মুক্ত করে দিলাম।'

এভাবে আবু মাসউদ নিভিয়ে দিলেন নবিজির ক্রোধ; আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত করে দিলেন দাসকে।

এবার নবিজি তাকে বললেন, 'শোনো আবু মাসউদ, যদি তুমি তা না করতে তাহলে আগুন তোমাকে গ্রাস করে নিত!'[১]

অর্থাৎ, আবু মাসউদ যদি এই ক্রীতদাসকে মুক্ত না করতেন, নিগ্রহ-নির্যাতনের অমানবিক দশা থেকে তার মুক্তির ব্যবস্থা না করতেন, তবে এই চাবুকের আঘাত তাকে পরকালে আগুন হয়ে গ্রাস করত।

বস্তুত, জাহিলিয়াতের যাবতীয় ভ্রান্তি ও কুসংস্কারের সাময়িক প্রতিকারের লক্ষ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ঘটেনি। তিনি তো এসেছিলেন অন্ধকার সমাজের সমস্ত অন্যায়-অনাচার সমূলে উৎপাটন করতে। মানুষ ও সমাজের মানসপট থেকে জাহিলিয়াতের কলুষিত আদর্শের ছাপ পরিপূর্ণরূপে মুছে ফেলে ন্যায়-নীতি, মানবিকতা আর বিবেক জাগিয়ে তুলতে, যা জাহিলিয়াতের সময়ে তাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। তিনি সচেষ্ট ছিলেন তাদের মাঝে সকল মানবিক গুণের সমাহার ঘটাতে, যেন একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে তাদের দীপ্তি ও প্রভা পূর্ণতা লাভ করে। দয়া ও মানবিকতা বিবর্জিত মানুষ তো এক উদ্ভট গাছের মতো, যার কোনো পাতা নেই, ফল নেই, নেই কোনো ছায়াও।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৬৫৯

Scanned with CamScanner

আব্বাসের কান্না

বদরের রণাঙ্গন থেকে বিজয়ী বেশে ফিরছিল মুসলিম বাহিনী। বন্দীদের হাত-পা শক্ত শৃঙ্খলে বাঁধা। মহান সেনাপতি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে মুসলিম বাহিনী রাত্রিযাপনের জন্য পথিমধ্যে যাত্রা স্থগিত করে।

বিজয়ের সুখ ও আনন্দে পরিপূর্ণ সেই রাত। ইসলামের জন্য সেই দিনটি ছিল অতুলনীয় মর্যাদা ও সম্মানের। এত আনন্দের মাঝেও সাহাবিরা লক্ষ করলেন, প্রিয় নবিজির চোখে ঘুম নেই। এমন আনন্দঘন সময়ে কী এমন কারণ থাকতে পারে, যা আল্লাহর রাসুলের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে? সাহাবিগণ কৌতূহল চেপে রাখতে পারলেন না। কেউ একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার অনিদ্রার কারণ কী? নিস্তব্ধ রাতের মৌন ভেদ করে উত্তর এলো, 'আব্বাসের কান্না আমাকে নির্ঘুম করেছে।'

সুবহানাল্লাহ! এক যুদ্ধবন্দীর গোঙানি যে হৃদয়কে এতটা কাতর করতে পারে, সেই হৃদয়ের গহিনে দয়া ও মানবতার ব্যাপ্তি তাহলে কতখানি! সাহাবিরা যুদ্ধবন্দীদের কাছে গিয়ে আব্বাসের বাঁধন শিথিল করে দেন, যাতে পৃথিবীর সবচেয়ে দয়ালু হৃদয়ের মানুষটি পরম শান্তিতে ঘুমাতে পারেন।

এটা ছিল সেই মহত্তম হৃদয়; শক্তি ও সক্ষমতার চূড়ায় থাকার পরেও যা দয়া ও উদারতার মহান নীতি থেকে বিস্মৃত হতো না। একদিকে কুফর ও অবিশ্বাসের প্রতি প্রচণ্ড কঠোর সে হৃদয়, অন্যদিকে ঈমান ও বিশ্বাসের পক্ষে তা হেসে উঠতে পারে নিঃসংকোচে। প্রয়োজনে আবু জাহলের[১] সামনে প্রচণ্ড ক্রোধে গর্জে উঠতে পারে যে সিংহ-হৃদয়, সেই একই হৃদয় নির্ঘুম থাকে যুদ্ধবন্দী আব্বাসের কাতর ধ্বনিতে।

অনুপম যুদ্ধনীতি

দুটি বাহিনীর মাঝে যখন যুদ্ধ বাধে তখন স্বাভাবিকভাবেই অনেক ফল-ফুলের বাগান ধ্বংস হয়ে যায়, উজাড় হয়ে যায় অগণিত গাছ-গাছালি, বন ও পশুপাখিদের আবাস। কিন্তু যোদ্ধা যদি হন ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে মহত্তম ও দয়ালু মানুষটি, তবে এসবের কিছুই ঘটবে না। ভয়াবহ যুদ্ধেও তিনি অবতীর্ণ হতেন মহৎ ও উদার চরিত্র

---

[১] আবু জাহিল, আবু জাহেল কিংবা আবু জেহেল—কোনোটিই পুরোপুরি শুদ্ধ নয়।

Scanned with CamScanner

নিয়ে। তার নেতৃত্বে পরিচালিত পবিত্র যুদ্ধের গালিচায় এক ফোঁটা নিষ্পাপ রক্তও বরদাশত করতেন না তিনি।

'যুদ্ধের মাঠে তোমরা হত্যা করবে না কোনো নারীকে, কোনো শিশুকে, কোনো অতিশয় বৃদ্ধকে।'[১]

সেই মহত্তম মানুষটি বলতে চান, দেখো, তোমাদের লাগামহীন যুদ্ধজয়ের নেশা ও আকাঙ্ক্ষা যেন কোনো নিষ্পাপ শিশুর মায়াভরা দৃষ্টি কেড়ে না নেয়, তার সামনে যা হচ্ছে তাতে তার কোনো দোষ নেই। কিংবা যুদ্ধের ধোঁয়াটে উন্মাদনার সময়ে কোনো নারী যেন বে-আব্রু না হয়। তাকে পুরুষের স্তরে গণ্য করে কোনো রকম আঘাত করবে না। নারীর দুর্বল শরীরে অসতর্ক আঘাতে হয়তো তার জীবননাশ হয়ে যেতে পারে। অথবা লাঠিতে ভর করে চলা কোনো অতি বৃদ্ধ, তির-তলোয়ার ধারণে যে অক্ষম, তার গায়ে তোমাদের হৃদয়ে জ্বলতে থাকা প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ো না। দ্বীন ইসলামের নামে এমন কাপুরুষোচিত হত্যা কোনোভাবেই শোভা পায় না।

রহমতের চাদর

এক নারী শয়তানের প্ররোচনায় ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়েছিল। এরপর অনুশোচনার আগুনে জ্বলতে থাকে তার হৃদয়। বিবেক ও অন্তরের দংশন আর্তচিৎকার হয়ে বেরিয়ে আসে আল্লাহর রাসুলের সামনে—'আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি, আমাকে পবিত্র করুন, ইয়া রাসুলুল্লাহ!'

রহমতের নবি ভালো করেই জানেন, ব্যভিচার থেকে পবিত্রতার অর্থ হলো পাথর মেরে হত্যা করা। এটাই শরিয়ত-নির্ধারিত শাস্তি। নবিজি চাইছিলেন এই স্বীকারোক্তি প্রকাশিত না হোক। তার ইচ্ছা, নারীটি যেন নিজের গোপন গুনাহের জঞ্জালটি আপন নীরব তাওবায় মিটিয়ে নেয়, নিজের ব্যাপারে এমন অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে সে অপরাধ স্বীকারের সময় নবিজি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন, যেন তিনি কিছুই শোনেননি।

কিন্তু নারীটি ভীষণ নাছোড়বান্দা। অনুশোচনার যে আগুন তার হৃদয়ে জ্বলছে, তা নির্বাপনে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ক্ষণে ক্ষণে যে আর্তচিৎকার তার ভেতরটাকে নারকীয়

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬১৬; হাদিসটি যইফ

Scanned with CamScanner

অনুভূতি দান করছে, তা না থামিয়ে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব না। অন্যপাশে গিয়ে আবার সে আবেদন করে—'আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি, আমাকে পবিত্র করুন, ইয়া রাসুলুল্লাহ!'

নবিজি দূরে কোথাও তাকিয়ে থাকেন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। যেন স্ত্রীলোকটি পালিয়ে বাঁচতে পারে, অথবা সে যেন সংবিৎ ফিরে পায়, নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জন মানেই তো মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া।

কিন্তু সে তার অবস্থানে অনড়। বারংবার আওড়াতে থাকে—'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি ব্যভিচার করেছি, আমার গর্ভে ব্যভিচারের কলঙ্কিত চিহ্ন। অনুগ্রহ করে আমাকে পবিত্র করে দিন।'

দীর্ঘসময় পর আল্লাহর রাসুল তার কথা শুনতে রাজি হন, স্ত্রীলোকটি তার অপরাধের বিবরণ পেশ করে। সব শুনে রাসুলুল্লাহ তাকে আরেকটি বার শাস্তি থেকে পরিত্রাণের সুযোগ করে দেওয়ার ইচ্ছা করেন; হয়তো সে নিজের অপরাধ আড়াল করে শাস্তি থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। তাকে বলেন, 'তুমি এখন চলে যাও। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর এসো।'

দয়ার নবি ভেবেছিলেন, পাপবোধ ও অনুতাপের যে আগুন তার হৃদয়কে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিচ্ছে, তা নির্বাপিত হওয়ার জন্য হয়তো ৯ মাসই যথেষ্ট। ততদিনে হয়তো প্রশমিত হয়ে যাবে তার অন্তর্দাহ, হয়তো নিজেকে গোপন করে সে হারিয়ে যাবে শত চেনা-অচেনা মানুষের ভিড়ে। আর আপন রবের কাছে অনুতাপের অশ্রু নিবেদন করে মুছে ফেলবে গুনাহর সমস্ত কালিমা।

নির্ধারিত সময় শেষ হলো। মহিলাটি রাসুলুল্লাহর দরবারে ঠিক ৯ মাস পর এসে হাজির। কোলে তার নবজাতক শিশু। আল্লাহর রাসুল তাকে আবার ফিরিয়ে দেন। পূর্বের চেয়েও বেশি সময় ধার্য করে দিয়ে তিনি বলেন, 'যাও, সন্তানকে দুধ ছাড়ানোর পর এসো।'

তারমানে আল্লাহর রাসুল তাকে আরও দুই বছরের সময় বেঁধে দিলেন। দয়ালু নবির ইচ্ছা, গুনাহগার হতভাগী এই মা যেন তার শিশুসন্তানের সাথে হেসে খেলে আনন্দে বেঁচে থাকে, কৃত অপরাধের কথা ভুলে গিয়ে আল্লাহর রহমতের ছায়ায় নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে। কিন্তু তার পাপবোধ ছিল এই দীর্ঘ দু-বছরের

Scanned with CamScanner

চেয়েও অধিক শক্তিশালী। তার মাতৃত্বের অনুভূতি অনেক দুর্বল হয়ে গিয়েছিল হৃদয়ে জ্বলতে থাকা অপরাধবোধের কাছে। ফলে দুই বছর বাদে, অর্থাৎ শিশুসন্তানের দুধ ছাড়ানোর পর স্ত্রীলোকটি আবার ফিরে আসে। এইবার নবিজি তার ওপর শরিয়তের নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করেন।

এই নারী যে আত্মিক সংকট ও পীড়নের মধ্যে দিনাতিপাত করছিল, তাকে দয়ার চাদরে ঢেকে নেওয়ার জন্য, অপরাধবোধের যাতনায় কাতর নির্মল হৃদয়টির যন্ত্রণা প্রশমনের জন্য রাহমাতুল্লিল আলামিন, বিশ্বজনীন করুণা ও রহমতস্বরূপ রাসুলুল্লাহর কী প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

একমাত্র সত্য জীবনদর্শনের শেষ নবি এমন দয়া ও করুণা তার পবিত্র মনে ধারণ করতেন, সেই জীবনাদর্শকেই বর্তমান সময়ে 'বর্বর' আখ্যা দেওয়া হয়! বলা হয়, তিনিই নাকি হত্যা, ধ্বংস ও রক্তপাতের সংস্কৃতি চালু করেছেন! নিঃসন্দেহে এটা এমন নির্জলা মিথ্যাচার, যার ওপর আর কোনো মিথ্যা হয় না। এটা এমন অন্যায়, যা সমস্ত অন্যায়কেই ছাপিয়ে যায়।

Scanned with CamScanner

তুচ্ছ যে জীবন

'হে দুনিয়া, হে দ্বীনহীন, অন্য কাউকে গিয়ে ধোঁকা দে; তোর ভোগ-বিলাসের উপকরণ অতি তুচ্ছ, আর তোর জীবন তো খুবই সংক্ষিপ্ত...!'

কথাগুলো বলেছিলেন রাসুলুল্লাহর অন্যতম শিষ্য আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু। পার্থিব জীবন ও তার ভোগ-বিলাসের প্রতি এই যদি হয় শিষ্যের অবস্থান, তাহলে কেমন হতে পারেন তার উস্তায?

সর্বপ্রথম যে শিক্ষাটি আল্লাহর নবি তার ছাত্রদের মনে গেঁথে দিয়েছিলেন, তা হলো, এই পার্থিব জীবন স্থায়ী ঠিকানা নয়, আসল গন্তব্যে চলার রাস্তা মাত্র। এই দুনিয়া পারাপারের স্রেফ একটি সেতু, এখানে খড়কুটো কুড়িয়ে আগলে রাখা নেহাতই বোকামি। সুতরাং জীবিকার দৈন্যদশা, চলার পথের নানা সংকট ও বৈরিতা, জীবনে উদ্ভূত যেকোনো পরিস্থিতিতেই হৃদয়ে সন্তুষ্টি নিয়ে পথ চলতে হবে। 'দুনিয়া' শব্দটিকে দীনতা ও হীনতার সমার্থক ভেবে তাকে স্থান দিতে হবে মনের সর্বনিম্ন কুঠুরিতে, যেন একে নিয়ে মুহূর্তের আলাপ কিংবা বিন্দুমাত্র স্বপ্ন-আশায় ভোগার সুযোগ না হয়।

পার্থিব জীবন নিয়ে রাসুলুল্লাহর এমন পাঠ ও দীক্ষার ফলাফল হলেন তার সাহাবিগণ।

আবু বকরকে দেখুন, জীবনযাপনে দুনিয়ার চাইতে আখিরাতের সাথেই যার সম্পর্ক প্রগাঢ় ছিল।

Scanned with CamScanner

উমার, যিনি সবাইকে বলতেন—'তোমরা জীবনযাপনে অনাড়ম্বর হও, কারণ এসব নিয়ামত চিরস্থায়ী নয়।'

আর উসমানকে দেখুন, যিনি হাতে কুরআন রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

এবং আবু যার, যিনি দুনিয়া থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, নিজেকে দাফন করে ফেলেছিলেন একাকিত্বের মাঝে।

আর দেখুন বিলালকে, যখন মৃত্যু সকল আয়োজন নিয়ে উপস্থিত তার কাছে, তখন আবেগে উদ্বেলিত হয়ে বলে উঠলেন—শিগগিরই মিলিত হব প্রিয়জনদের সাথে; মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাথিদের সাথে।

অথবা আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার কথাই ধরুন, পথে কোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে যিনি দুনিয়ার কথা বিস্মৃত হতেন আর বলতেন, 'চলো, আমরা কিছুক্ষণ ঈমানচর্চা করি।'

দুনিয়ার স্বরূপ

নবিজি একদিন একটি জীর্ণশীর্ণ পুরাতন চাটাইয়ের ওপর ঘুমিয়েছিলেন। ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর সাহাবিরা দেখলেন, চাটাইয়ের খাঁজগুলো নিদারুণভাবে নবিজির পবিত্র দেহের ওপর ছাপ বসিয়ে দিয়েছে। আল্লাহর রাসুল যে দুনিয়া থেকে সামান্য একটি নরম, মসৃণ বিছানা গ্রহণ করেননি, সে দুনিয়া তাদের কাছে কী করে আরাধ্য হয়? সে দুনিয়া তো অতি তুচ্ছ, নগণ্য! যে দুনিয়ায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির জন্য স্বাচ্ছন্দ্যে পিঠ ঠেকিয়ে ঘুমানোর মতো একটা বিছানাও থাকে না, সেই দুনিয়ার কী এমন মূল্য থাকতে পারে?

তবুও তাদের কষ্ট হয়। পরম ভালোবাসা-মাখা কণ্ঠে তারা বলে ওঠেন—হে আল্লাহর রাসুল, আমরা যদি আপনার জন্য একটি নরম বিছানা প্রস্তুত করে দিই!

উত্তরে নবিজি এমন কথা উচ্চারণ করেন, যাতে পুরো দুনিয়া তার শিকড়সুদ্ধ উপড়ে গিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তিনি বললেন—مَا لِي وَلِلدُّنْيَا—দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক?

Scanned with CamScanner

নবিজির উচ্চারিত প্রচণ্ড শক্তিশালী এই শব্দগুচ্ছ যেন দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হয়—দুনিয়ার সাথে আমার কীসের সম্পর্ক? দুনিয়ার সাথে আমার কী? দুনিয়া আর আমার মাঝে কীসের বন্ধন?

হঠাৎ আচমকা হাওয়ায় দপ করে যেন নিভে যেতে চায় ধরণির বাতি...

অতঃপর কথা শেষ করেন নবিজি—

مَا لِي وَلِلدُّنْيَا ؟ مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? দুনিয়াতে আমার অবস্থান সেই মুসাফিরের মতো, যে কোনো গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নেয়, এরপর তাকে পেছনে রেখে আবার চলতে শুরু করে।[১]

এই যে শব্দমালা—مَا لِي وَلِلدُّنْيَا—'দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক'—এর দ্যোতনা প্রতিধ্বনিত হয় সাহাবিদের অন্তরের অন্দরে। সেই পবিত্র হৃদয়ের মাহাত্ম্য ও ব্যাপ্তির ইঙ্গিত তারা পেয়ে যান এই ক'টি শব্দের মাঝেই। তারা বুঝতে পারেন, এই পার্থিব জীবন ফুলে-ফলে সুশোভিত কোনো উদ্যান নয়, এমনকি নয় একটি বৃক্ষের সমতুল্যও। একটি অপস্রিয়মাণ ছায়ার মতো, গ্লাসের তলায় পড়ে থাকা সামান্য অবহেলিত পানির মতো এই দুনিয়া। বালুসাগরে পতিত এক ফোঁটা নগণ্য পানিমাত্র এই পার্থিব ভোগ-সামগ্রী, যার অস্তিত্ব চোখে পড়ার আগেই বিলীন হয়ে যায়।

করুণার হাসি

মক্কার মুশরিকরা নবিজির সামনে দুনিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে হাজির হয়। তাদের ইচ্ছা উপযুক্ত বিনিময় দিয়ে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দ্বীন থেকে নিবৃত্ত করবে। তারা জানে না, সেই মুহূর্তে নবিজির কাছে তাদের আকাঙ্ক্ষা কতটা হাস্যকর ঠেকেছিল।

চাচা আবু তালিবও উপস্থিত ছিলেন সেই 'দরদামের বৈঠকে'। তিনি অপেক্ষা করছিলেন কখন ভাতিজা এই হাস্যকর প্রস্তাবের মুণ্ডুপাত করে আবু জাহলের মুখে

---

[১] *জামি তিরমিজি* : ২৩৭৭

Scanned with CamScanner

চুনকালি দেবেন। এরপর উচ্চারিত হয় সেই উত্তর, যা বিস্মৃত হওয়া ইতিহাসের জন্য খুব সহজ নয়—'আল্লাহর কসম, যদি এই দ্বীনকে ছাড়ার জন্য তোমরা আমার এক হাতে সূর্য আর অন্য হাতে চাঁদও এনে দাও, তবু আমি তা কখনোই ছাড়ব না।'[১]

বাতিলের আশাভঙ্গ হয়, ভেস্তে যায় সমস্ত বিনিময়-প্রচেষ্টা।

এমন প্রবল প্রত্যাখ্যান শোনার পর আবু তালিব যেন সকৌতুকে চোখ বুলিয়ে নেন আবু জাহলের চেহারায়, নির্বাক দৃষ্টি হেনে যেন বলতে চান তাকে—ভাতিজা মুহাম্মাদ আমার চোখে মহান। কারণ, আমি দেখেছি, দুনিয়া তার কাছে অতি তুচ্ছ!

আবু জাহলের সমস্ত আয়োজন উপেক্ষিতই থেকে যায়। অপমান ও লাঞ্ছনার কদাকার চেহারা নিয়ে সে ফিরে যায় ব্যর্থ মনে। কুফর ও অবিশ্বাসের প্রতি বিদ্রুপ ও করুণার হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মানবতার শ্রেষ্ঠতম পুরুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মাছির অতি তুচ্ছ ডানা

নবিজি একদিন কিছু ধনসম্পদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সাহাবিরা পেছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন নবিজির বক্তব্যের জন্য। কিন্তু নবিজি যখন দুনিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, তাদের কাছে তখন তা খুবই অপরিচিত ও অস্পষ্ট ঠেকল। তারা নিজেদের বিস্ময় প্রকাশ করলেন একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ির মাধ্যমে। নবিজির ছোট্ট মন্তব্যটি ছিল—الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ—'দুনিয়া অভিশপ্ত।'

এমনই আচমকা আঘাতে নবিজি ভেঙে ফেললেন মানুষের মনে পুঞ্জীভূত দুনিয়ার মজবুত ভাবমূর্তি, ধ্বংস করলেন স্তূপীকৃত জঞ্জালের পাহাড়। মনের জমিনে নিড়ানি চালিয়ে উপড়ে ফেললেন যাবতীয় কুসংস্কার ও আগাছা। এরপর বক্তব্য শেষ করলেন এভাবে—

"

أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا ، إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى ، وَمَا وَالاهُ ، وَعَالِماً وَمُتَعَلِّماً

[১] হাদিসটির সনদ দুর্বল। শাস্ত্রজ্ঞ আলিমগণ ইতিহাস ও সিরাতের বর্ণনার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে নমনীয়তা অবলম্বনের পক্ষে মত দেন।

Scanned with CamScanner

দুনিয়া অভিশপ্ত, অভিশপ্ত তার সমস্ত বিষয়। তবে আল্লাহর যিকির ও যিকিরের সাথে সংগতিপূর্ণ আমল, দ্বীনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এর অন্তর্ভুক্ত নয়।[১]

মূলত নবিজির চোখে দুনিয়া ছিল উপেক্ষিত। সংক্ষেপে বললে, দুনিয়া হলো 'অভিশপ্ত'। অর্থাৎ, দুনিয়াদারি যদি আল্লাহমুখী না হয়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমত থেকে, বরকত থেকে, তাওফিক থেকে অনেক অনেক দূরে।

এরপরও যাদের অন্তরের কোণায় তখনো দুনিয়ার প্রতি কিছু মুগ্ধতা রয়ে গিয়েছিল, তাদের পুরোপুরি দুনিয়া-আসক্তি থেকে মুক্ত করতে, সেই সাথে আমার এবং আপনার মাঝে থাকা দুনিয়াপ্রেম দূর করতে কোনো একদিন তিনি বললেন, 'যদি আল্লাহর কাছে মাছির ডানা-পরিমাণ মূল্যও থাকত দুনিয়ার, তবে তিনি এক ঢোক পানিও কোনো কাফিরকে পান করতে দিতেন না।'[২]

অতি তুচ্ছ একটি মাছির ডানারও যে পরিমাণ মূল্য থাকে, সমস্ত চাকচিক্য ও জৌলুস সত্ত্বেও সে পরিমাণ মূল্যমান দুনিয়ার নেই! এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমার আর আপনার নফস, মাছির অতি তুচ্ছ ডানাটির কোন অংশে ঝুলে আছে?

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুলের কাছে কখনো কোনো কিছু চাওয়া হয়েছে, আর তিনি 'না' বলেছেন, এমনটা কখনো হয়নি।[৩]

যে উদারতম পুরুষ তার শিষ্যদের শিখিয়েছেন, এই দুনিয়া 'হ্যাঁ' ও 'না' থেকেও অনেক বেশি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ, তিনি কি কোনো প্রার্থীকে 'না' বলতে পারেন?

একবার এক নারী নবিজিকে একটি চাদর উপহার দেন। সে সময় একটি চাদরের খুবই প্রয়োজন ছিল তার। উপহার পাওয়া চাদরটি পরলে এক ব্যক্তি বলে ওঠেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, এই চাদরটি কতই না সুন্দর! এটি আমাকে দিয়ে দিন।' নবিজি এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।' তারপর চাদরটি গা থেকে খুলে তাকে দিয়ে দিলেন।[৪]

---

[১] *জামি তিরমিজি* : ২৩২২

[২] *জামি তিরমিজি* : ২৩২০

[৩] *সহিহ বুখারি* : ৬০৩৪

[৪] *সহিহ বুখারি* : ৬০৩৬

Scanned with CamScanner

এই মানুষটিকেই নাকি কুরাইশরা বলেছিল—যদি তুমি রাজত্ব চাও, তবে তোমাকে রাজ্যের মালিক বানিয়ে দেব! তাদের অজ্ঞতা, নবিজির অভিধানে 'রাজত্ব' শব্দের কোনো অস্তিত্বই নেই।

উদারতম মানুষ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সান্নিধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন সাহাবি আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি নবিজির বিষয়ে আর সবার চেয়ে বেশি জানতেন। তিনি বলেন, নবিজি আগামী দিনের জন্য কোনো কিছুই জমা করে রাখতেন না।[১]

নিজেদের ব্যাপারে আমরা একটু চিন্তা করতে পারি। আমাদের সঞ্চয়, ব্যাংকে থাকা ব্যালেন্স, প্রতিনিয়ত নিজের সঙ্গে বহন করা বিচিত্র রকমের 'দুনিয়া' সম্পর্কে ভেবে দেখতে পারি আমরা। কতটা নির্ভরতা আর আনুগত্য আমরা সঁপে দিয়েছি দুনিয়ার কাছে।

সাহাবি আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুলের কাছ থেকে কেউ কখনো খালি হাতে ফিরে যেত না।[২] একবার এক লোক এলো। নবিজি তাকে দুই পাহাড়ের মাঝে উপত্যকা-ভর্তি মেষ দান করেন। এরপর লোকটি তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যায় আর বলতে থাকে, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। মুহাম্মাদ এমন উদার ব্যক্তি, যিনি কখনো দারিদ্র্যের ভয় করেন না!'

দুনিয়া নবিজির কাছে এতটাই অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল যে, তিনি নিজ হাতে স্পর্শ করে দান করার প্রয়োজনও মনে করতেন না। দুনিয়ার কোনো সামগ্রীর সাথে ন্যূনতম সংযোগও এড়িয়ে চলতেন তিনি।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—'যদি আমার কাছে উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে, তবে তিন রাত্রি সেসবের ছিটেফোঁটাও আমার কাছে অবশিষ্ট থাকুক তা আমি চাইব না।'[৩]

---

[১] *জামি তিরমিজি* : ২৩৬২

[২] *সহিহ বুখারি* : ৬০৩৪

[৩] *সহিহ বুখারি* : ২৩৮৯; *সহিহ মুসলিম* : ৯৯১

Scanned with CamScanner

এমন কথা যিনি বলতে পারেন, তার হৃদয়ের বেলাভূমিতে দুনিয়ার বিপুল চাকচিক্য ঊর্মিমালার মতো ভেঙে আছড়ে পড়তে বাধ্য। ফলে তার হৃদয়ের গভীরতা ও বদান্যতার পরিমাপ করা ইতিহাসের জন্য এক কঠিনই বটে।

পথিক

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন নবিভক্তির এক জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনি নিজেকে সুশোভিত করেছিলেন নবিজির রঙে ও সুবাসে। তিনি ছিলেন নবিজিকে সূক্ষ্মভাবে অনুসরণকারী একজন সাহাবি। কেবল ইবাদত ও অনুশাসনের ক্ষেত্রেই নয়; বরং নবিজির দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ থেকে সাধারণ অভ্যাসের ক্ষেত্রেও তিনি তার পূর্ণ অনুসরণ করতেন। এমনকি যেসব গাছের ডালপালার নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় নবিজি তার মাথা নিচু করে অতিক্রম করতেন, সেই গাছগুলো কেটে ফেলার পরও ইবনু উমার ওই স্থান অতিক্রম করার সময় তার মাথা নিচু করে যেতেন। অনুসরণে তিনি ছিলেন এতটাই অগ্রগামী!

গাছের কোনো চিহ্নই নেই, নেই এর কোনো ডালপালার অস্তিত্ব। কিন্তু ইবনু উমারের হৃদয়ে প্রিয় মানুষটির পবিত্র স্মৃতি সবসময় ছিল অটুট।

এই মহান সাহাবি দুনিয়াবিমুখতার এক উজ্জ্বল নমুনা ছিলেন। তার কোথাও দুনিয়াদারির ছিটেফোঁটাও ছিল না; না তার গৃহে, আর না তার অন্তরে। দুনিয়া থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গুটিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। দুনিয়া থেকে তার অন্তর ছিল পুরোপুরি মুক্ত। তার এমন দুনিয়াবিমুখতার পেছনে একটি কারণ আছে। তার মুখেই শোনা যাক সেটা—

ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন, দুনিয়াতে এমনভাবে সময় যাপন করো, যেন তুমি কোনো অপরিচিত আগন্তুক অথবা মুসাফির।[১]

আল্লাহর রাসুলের মুখনিঃসৃত একটি মাত্র কথাতেই ইবনু উমার পরিণত হলেন এই দুনিয়ার সংকীর্ণ অলিগলির একজন অপরিচিত আগন্তুকে। এরপর তার গৃহের দরজায় খিলাফতের দায়িত্ব এসে দাঁড়িয়েছিল, তিনি ঘরের দরজা খুলে দুনিয়াকে সবিনয়ে দূরে সরিয়ে দিলেন।

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৬৪১৬

Scanned with CamScanner

আল্লাহর রাসুল তার সাহাবিদের অন্তরে খুব দৃঢ়ভাবে যুহদ বা দুনিয়াবিমুখতার বীজ বপন করে দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি ভালো করেই জানতেন, দুনিয়ার প্রতি আসক্তিই হলো সেই বিপজ্জনক ও ভয়ংকরতম দরজা, যা দিয়ে মৃত্যুভীতি, দ্বীনহীনতা ও যাবতীয় ভ্রান্তি-বিস্মৃতি হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। এ কারণেই দেখা যায়, জীবনের প্রত্যেকটি সময়ে ও সুযোগে, আলোচনা ও উপদেশে দুনিয়া সম্পর্কে, দুনিয়ার বিপদ সম্পর্কে তার পবিত্র মুখে সতর্কতা ও সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

নবিজি বলেছেন, 'আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের আশঙ্কা করি না; বরং আমি আশঙ্কা করি, তোমাদের ওপর দুনিয়ার নিয়ামত ঢেলে দেওয়া হয় কি না, যেমনিভাবে পূর্ববর্তী উম্মাতদের ওপর ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তোমরা তা অর্জনে প্রতিযোগিতা শুরু করে দাও কি না, যেমনিভাবে পূর্ববর্তী উম্মাতরা করেছিল। এরপর দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা তোমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় কি না যেমনিভাবে তা পূর্ববর্তী উম্মতদের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল।'[১]

বিলিয়ে দাও

একবার নবিজির কাছে বাহরাইন অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ উপস্থিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহর কাছে আনা এ যাবৎকালের সমস্ত সম্পদের চেয়ে সেসবের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি।

যখন সাহাবিগণ এই বিপুল পরিমাণ সম্পদের সংবাদ নবিজিকে জানালেন, তিনি নির্দেশ দিলেন, 'এসব সম্পদ মসজিদে অভাবী মানুষগুলোর মাঝে বিলিয়ে দাও।'

এ যেন দুনিয়াবিমুখতার বাস্তবিক মানদণ্ড, তার মুখনিঃসৃত 'দুনিয়ার সাথে আমার কীসের সম্পর্ক' কথাটির প্রায়োগিক নমুনা।

না, কোনো তালাবন্ধ বিশেষ কোষাগারে সেগুলো রেখে দেননি কিংবা সূক্ষ্ম-জটিল ফর্দ-তালিকা তৈরি করে সেসব সম্পদের আদ্যোপান্ত হিসেব-নিকেশ করেননি। অথবা সেসব সম্পদ সংরক্ষণে নিযুক্ত করেননি কোনো পাহারাদার সেপাই। 'মসজিদে সাধারণ মানুষের মাঝে বিলিয়ে দাও এসব সম্পদ'—কারণ দুনিয়া দীর্ঘসময় ব্যয় করার মতো কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থান নয়। এই দুনিয়া এতটা মনোযোগ ও মূল্যায়নের হকদার না।

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৩১৫৮

Scanned with CamScanner

নিজেকে ভুলে যাওয়া

সহনশীল তো তিনি, যিনি প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা রাখলেও ক্ষমাকে প্রাধান্য দেন। শাস্তি দেওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যিনি তিরস্কারের বদলে পুরস্কারের পথে হাঁটেন, ভেঙে পড়া দেওয়াল যিনি ধ্বংস না করে সুদৃঢ় করে দেন। তিনিই তো সহনশীলতা প্রদর্শনকারী।

কিন্তু যে বা যারা আপনার প্রতি নিগ্রহ-নির্যাতন চালিয়েছে, আপনাকে কষ্ট দিয়েছে নানানভাবে, দিনের পর দিন ধস নামিয়েছে শরীর ও মনে, আপনার সমস্ত খুশি-আনন্দ কেড়ে নিতে উদগ্রীব থেকেছে, তাদের ক্ষমা করে দেওয়া কতটা সহজ?

মোটেও সহজ নয়। মানব-হৃদয়ের ধরনই এমন। আপনি ক্ষমা ও সহনশীলতামূলক কোনো একটা শব্দ বা বাক্য হুট করে বেশ নির্বিকারভাবে বলে দিলেন, আর হয়ে গেল—তা তো নয়। বরং আপনাকে তা উচ্চারণ করতে হবে হৃদয় ও আত্মার সাথে পূর্ণ অনুভবের মিশেল ঘটিয়ে। যেন আপনার শত্রুই আপনার পরম বন্ধু—কথায়, কাজে, দয়া আর অনুগ্রহে এরই পূর্ণ প্রকাশ ঘটবে। তবেই না ক্ষমা ও সহনশীলতা প্রদর্শনে আপনি সার্থক।

এমন কঠিন ও জটিল কাজটাই ছিল নবিজির কাছে একদম সহজ। এমন মহত্ত্ব ও উদারতা মিশে ছিল তার রক্ত-মাংসে। ক্লান্তি ও মনঃকষ্টে ভারাক্রান্ত দিনগুলোর মাঝে এমন ক্ষমাশীল আচরণই ছিল নবিজির প্রতিদিনকার চর্চা। ফলে শত্রুদের

Scanned with CamScanner

প্রতি, নিপীড়ক ও অত্যাচারীদের প্রতি তিনি ছিলেন উদার, সহনশীল। চরম, জঘন্য শত্রুকে ক্ষমা করে দেওয়াকে তিনি অসম্ভব মনে করতেন না।

ফিরআউনের প্রতি ক্ষমা

যদি শয়তানকে এমন কোনো মানুষের চেহারায় কল্পনা করার চেষ্টা করি, যে সকাল-সন্ধ্যা মক্কার অলিতে-গলিতে বিচরণ করে, ঘুরে বেড়ায়, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আবু জাহল ছাড়া অন্য কারো চেহারায় তা কল্পনা করা সম্ভব নয়। এ সেই আবু জাহল, যে মুসলিমদের অন্তরে কেবলই অনিষ্ট, তীব্র বিদ্রুপ আর নীল ষড়যন্ত্রের নিকৃষ্টতম প্রতীক। এমনকি আল্লাহর নবি পর্যন্ত তাকে 'এই উম্মাহর ফিরআউন' আখ্যা দিয়েছেন। তার অন্তরে ইসলামের প্রতি শত্রুতা, বিদ্বেষ, বিরোধিতা এবং অনিষ্টের যে কালো ছায়া বিস্তার করে ছিল তার ইঙ্গিতস্বরূপ আল্লাহর রাসুল এমন কথা বলেছিলেন।

এতকিছু সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই, ক্ষমা ও সহনশীলতার নবি তার মক্কার দিনগুলোতে এই চরম স্বেচ্ছাচারীর সমস্ত কুকর্মের প্রতিক্রিয়া নিজের মনেই দাফন করে রেখেছিলেন। তার সাথেও অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করতেন তিনি। আহ্বান করতেন আল্লাহ ও আখিরাতের দিকে। যেন সে আল্লাহর চরম শত্রু ছিল না, যেন সে কখনোই আখিরাত নিয়ে অতিরিক্ত ঠাট্টা-মশকরা করেনি।

এরপর মানবসভ্যতার ইতিহাসে বিরল ও নজিরবিহীন ক্ষমার এক মুহূর্ত উপস্থিত হয়, যখন নবিজি আল্লাহর কাছে দু-হাত তুলে উচ্চারণ করেন—'হে আল্লাহ, আবু জাহল কিংবা উমার ইবনুল খাত্তাব, এই দুজনের যাকে আপনার বেশি পছন্দ হয় তাকে দিয়ে আপনি ইসলামকে সম্মানিত করুন, শক্তিশালী করুন।'

যে পাপিষ্ঠ আল্লাহর রাসুলকে তিলে তিলে কষ্ট দিয়েছে, তার মান-সম্মান, সুনাম-সুখ্যাতি ধুলোমলিন করেছে, পদে পদে তার দাওয়াতি কাজে বাধা ও কষ্ট নিয়ে হাজির হয়েছে, বহুবার তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে, তারই প্রতি টগবগ করে ফুটতে থাকা প্রতিশোধস্পৃহাকে কী করে নবিজি পানি করলেন! শুধু তা-ই নয়, তার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করলেন পরম ব্যাকুলতার সাথে, যেন সে দাওয়াতি কাফেলায় যুক্ত হয়, অন্তর্ভুক্ত হয় তার সাথিদের দলে।

Scanned with CamScanner

সুবহানাল্লাহ! এ তো এমন পবিত্র আত্মার পক্ষেই সম্ভব, যা মাহাত্ম্য ও মহানুভবতা, গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের সবগুলো স্তর অতিক্রম করে উন্নীত হয়েছে সর্বোচ্চ শিখরে।

তোমাকে এখন কে বাঁচাবে

ক্লান্ত দেহে নবিজি একবার এক ছায়াদানকারী বৃক্ষের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, সাথে থাকা তরবারিটি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন গাছের ডালে। দাওয়াতের মহান দায়িত্ব-কর্তব্যে ক্লান্ত ও ভারাক্রান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন নবিজি।

এক বেদুইন, যে কিনা ভেতরে ভেতরে কুফরি লালন করত, সে আল্লাহর নবিকে দেখতে পেল। দীর্ঘদিন ধরে তার মনে সুপ্ত থাকা গোপন পরিকল্পনা জেগে উঠল এবার। মহান মানুষটিকে সুযোগমতো মেরে ফেলতে চায় সে। যে পবিত্র হাতটি দুর্দশাগ্রস্ত মানুষগুলোর সহায়, যে মহান আত্মা গরিব-দুখীদের জন্য অস্থির ও ব্যাকুল থাকেন সর্বদা, যিনি বিশ্ব মানবতার জন্য আল্লাহর বিশেষ রহমত ও উপহার, সেই পবিত্র হাতটিকে কেটে ফেলতে, সেই মহান রুহকে স্তব্ধ করে দিতে সে উদগ্রীব। নিজ জীবনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষটির জীবন, সে জীবনকেই কিনা শেষ করে দিতে চায় এই নরাধম বেদুইন!

হঠাৎ জেগে ওঠেন আল্লাহর রাসুল। তখনো তার তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ পুরোপুরি খোলেনি। তিনি দেখতে পান, বেদুইনটি খোলা তরবারি হাতে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। নবিজি তাকে দেখে মোটেও বিচলিত হলেন না; বরং বেদুইন লোকটিই অপ্রস্তুত ও হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। তার বুক ধড়ফড় করে ওঠে নবিজিকে দেখে।

বেদুইন ভীতকণ্ঠে জানতে চায়, তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ না? মহান আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসে বলীয়ান নবিজির জবাব আসে সুরক্ষিত দুর্গের মতো—'না!'

বেদুইনটি এবার তার হাতে থাকা তরবারিটির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ইঙ্গিত দেয়, সে এসেছে নবিজির জীবন নিতে। যেন বোঝাতে চায়, তার সাথে খোশগল্প করতে আসেনি। এরপর বলে, 'আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে?'

নবিজি প্রশান্ত হৃদয়ে উত্তর দিলেন—মহান আল্লাহ!

'মহান আল্লাহ' এই কথাটি যখন নবিজি উচ্চারণ করলেন, দুনিয়াসম এক প্রবল অনুভূতি ধাক্কা দিলো সেই বেদুইনকে। নবিজির মুখে আল্লাহর নাম শোনামাত্রই হাত

Scanned with CamScanner

থেকে তরবারিটি মাটিতে পড়ে যায় বেদুইনের। নবিজি স্বাভাবিকভাবে তরবারিটি মাটি থেকে উঠিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত বেদুইনের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন—'এবার আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে?' অসহায় বেদুইন বলে, 'তরবারিটির সর্বোত্তম ধারক হোন।'

নবিজি তাকে কিছুই বলেননি; বরং ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এরপর বেদুইন লোকটি তার নিজ সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে তাদের বলেছিল—'আমি এসেছি দুনিয়ার সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির কাছ থেকে...।'[১]

নবিজি যে উদারতা, মহত্ত্বের পরিচয় তখন দিয়েছিলেন, তা ছিল মরুচারী বেদুইনদের কাছে দুর্বোধ্য ও অপরিচিত কোনো বিষয়। মরুভূমির রুক্ষ, নিষ্ঠুর বেদুইনদের কাছে মুহাম্মাদের এই আচরণ ছিল জীবনের কূলকিনারাহীন এক রহস্য।

এমন মানুষ থাকা কী করে সম্ভব, যিনি নিজের সকল অনুভব-অনুভূতিকে যখন-তখন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন!

যে মুহূর্তে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায় মানুষের, থেমে যায় ঘড়ির কাঁটা, সে রকম একটি মুহূর্তে নবিজি এতটা প্রশান্ত, ধীর-স্থির ছিলেন যে, স্বাভাবিক বোধ-বুদ্ধি তা দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। যেন এমনই হওয়ার কথা ছিল, যেন এটাই তার প্রতিদিনকার অভ্যাস। হত্যাচেষ্টার প্রতিশোধ না নিয়ে উল্টো তিনি লোকটিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। যেন একটু আগে তার প্রাণ নিতে আসা সেই অপরাধী ঘাতকটি এই বেদুইন নয়!

মুক্তপ্রাণ

সাহাবি আনাস ইবনু মালিক নিজ চোখে দেখা একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, নবিজি প্রায়ই শক্ত প্রান্তবিশিষ্ট চাদর গায়ে দিয়ে হাঁটতেন। একবার এক বেদুইন লোক তার চাদর ধরে জোরে হেঁচকা টান মারে। সে এতটাই জোরে চাদর ধরে টান দিয়েছিল যে, আমি দেখলাম নবিজির কাঁধের ওপর চাদরের আঁচড় পড়ে গেছে। এরপর বেদুইনটি বলে, 'হে মুহাম্মাদ, তোমার কাছে থাকা আল্লাহর সম্পদের কিছু আমাকে দান করতে বলো।' নবিজি তার দিকে ফিরে মৃদু হেসে তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।[২]

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ২৯১০

[২] *সহিহ বুখারি* : ৫৮০৯; *সহিহ মুসলিম* : ১০৫৭

Scanned with CamScanner

আপনার-আমার অন্তরে অহংকার ও আত্মগৌরবের যে স্তূপ জমে আছে, সেগুলোকে 'হেঁচকা টান' মেরে ছুড়ে ফেলুন!

কল্পনা করুন, একজন সাধারণ বেদুইন আল্লাহর মনোনীত রাসুলকে সজোরে টেনে ধরেছে। সেই নির্দয় টানা-হেঁচড়ার কারণে সাহাবি আনাস তার গলায় লাল দাগ পড়ে যেতে দেখেছেন! এরপর বেদুইন রুক্ষ কর্কশ মরুভাষায় তাকে বলেছে, 'হে মুহাম্মাদ, তোমার কাছে থাকা আল্লাহর সম্পদের কিছু আমাকে দাও!'

এমন পরিস্থিতে তো ধৈর্য ফুরিয়ে যায়, বিনয় বিলীন হয়ে যায়, মিলিয়ে যায় ক্ষমা ও দয়ার অনুভূতি। অথচ নবিজি বেদুইনটির দিকে ফিরে তাকিয়েছেন হাসিমুখে!

তিনি কীভাবে পেরেছেন এমন সদয় আচরণ দেখাতে? তার মুক্ত-স্বাধীন দিগন্তবিস্তৃত হৃদয়ে মহানুভবতা ও উদারতার পরিধি কতটুকু ছিল?

ব্যথা দূর করার জন্য রাসুলুল্লাহর কাঁধের তো প্রয়োজন ছিল তারই পবিত্র হাতের একটু স্পর্শ, কিন্তু সেই সময়ে কীভাবে তিনি মধুর হাসি উপহার দিলেন!

রাসুলুল্লাহ তার প্রতিটি আচরণ ও কাজ-কর্ম এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন যে, তা বিশ্বাস করতে কল্পনাও হার মেনে যায়। যদি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মুহাদ্দিসগণ সেসব বর্ণনা না করতেন, তবে না জানি এসব শুনে সন্দেহ করে বসতাম আমরা। কারণ মানুষের ধৈর্য ও সহনশীলতা যত বেশিই হোক না কেন, দিনশেষে তার একটি নির্দিষ্ট পরিসীমা ও পরিধি আছে, আছে এমন একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব, যা অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

কিন্তু নবিজি তার জীবনের পরতে পরতে দুনিয়াবাসীর সামনে এমন সব নজির তুলে ধরেছেন যে, তিনি সকল মানুষের মাঝে অনন্য, মহান আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। নিঃসন্দেহে ধৈর্যগুণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পৃথিবীতে এক ও অদ্বিতীয়।

আপনি চাইলে

নবিজির রক্ত-মাংসে যেন রাগ বলে কিছু ছিল না, এতটাই সহনশীল ছিলেন তিনি। কঠিন মুহূর্তে তিনি ভুলে যেতেন দুঃখ ও যাতনার ভাষা। তাই তো জালিমের দুর্ব্যবহারও তাকে টলাতে পারত না, যেন তিনি সব ভুলে গেছেন। অন্যায়ভাবে অপমানিত হবার ঘটনাগুলোও তিনি মন থেকে সরিয়ে ফেলতেন অতি দ্রুততার

Scanned with CamScanner

সাথে। হয়তো অতীতের কোনো সাথি অথবা অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে অপমানিত হয়েছেন, তাতে কী! তিনি মনে রাখতেন না কিছুই।

নবিজি তায়িফ গিয়েছিলেন দ্বীনের দাওয়াত দিতে। সে ছিল বড় কঠিন ও কষ্টকর এক সফর। এই দাওয়াতি সফরের ফলাফল ছিল তিরস্কার, অপমান, বিতাড়ন— সবশেষে তার পবিত্র দেহ থেকে রক্তক্ষরণের ঘটনা।

তিনি ফিরছেন তায়িফ থেকে। রাজ্যের দুশ্চিন্তা চারিদিক থেকে যেন ঘিরে ধরে তাকে। তায়িফের লোকেরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তার পবিত্র দেহ থেকে ঝরিয়েছে অবিরল রক্তধারা, তিনি তো বড় আশা নিয়ে এসেছিলেন। এখন মক্কায় কীভাবে ফিরে যাবেন রাহমাতুল্লিল আলামিন! সেখানে আছে হঠকারী আবু জাহল, উদ্ধত অহংকারী আবু লাহাব, আর কথায় কথায় ঠাট্টা-বিদ্রুপে মেতে ওঠা উকবা। এই বাহ্যত ব্যর্থ সফর শেষে কোন মুখ নিয়ে তিনি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন? দুশ্চিন্তা তাকে ঘিরে ধরেছে চতুর্দিক থেকে।

সেই নিষ্ঠুর ও জর্জরিত সময়ে নবিজি যখন প্রচণ্ডভাবে ভেঙে পড়েছিলেন, তখন আসমান থেকে নেমে আসে স্বয়ং পাহাড়ের ফেরেশতা। যে নবিকে পুরোনো বন্ধুরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, যাকে নানা কটূক্তি ও বিদ্রুপের বাণে বিদ্ধ করে মিথ্যা ও প্রতারণার প্রতীকরূপে উপস্থাপন করেছে, সেই মহান সহনশীল রাসুলের কাছে একটি আবেদন নিয়ে নেমে এসেছেন পাহাড়ের ফেরেশতা। নবিজির কাছে আবেদন করছেন, 'আপনি চাইলে মক্কার এই দুই পাহাড় আমি এদের ওপর ধসিয়ে দেবো।'

ফেরেশতা যেন বলতে চাইলেন, হে মুহাম্মাদ, হে আল্লাহর প্রিয় বন্ধু, আপনি যদি চান, তবে আমি আবু জাহলকে প্রাণে মারতে পারি, যে শুধু আপনার সাথিদের ওপর নির্যাতন চালাতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে, কিংবা আপনি চাইলে আমি উকবা ইবনু আবি মুইতকেও নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি, যে আপনার পিঠের ওপর উটের নাড়িভুঁড়ি ফেলে আপনাকে অসম্মান করেছে অথবা আবু লাহাবকেও আমি শেষ করে দিতে পারি, যে মানুষের মাঝে আপনাকে মিথ্যুক হিসেবে প্রচার করেছে। আপনি এখনই আদেশ দিন, আপনার একটি ইঙ্গিতই আমার জন্য যথেষ্ট!

আপনি এখনই আদেশ দিন, মক্কায় পৌঁছে এইসব জালিম দুরাচারীর ছায়াটুকুও আপনি আর দেখতে পাবেন না। আপনি চাইলে জালিমের নিপীড়ন আর আত্মম্ভরিতা, বিদ্রুপকারীদের আস্ফালন ও উচ্চবাচ্যের প্রতিদিনকার গল্প দুই পাহাড়ের মাঝে চাপা

Scanned with CamScanner

দিয়ে চিরতরে শেষ করে দেবো।

ইতিহাসের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসা সেই মুহূর্তে আল্লাহর নবি সিদ্ধান্ত নেন, তিনি তার এই অশ্রুর কথা ভুলে যাবেন, ভুলে যাবেন সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও অপমানের কথাও। তার পবিত্র শরীর থেকে ঝরে পড়া রক্তের হক ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। অথচ তখনো তার শরীর থেকে বেয়ে পড়া রক্তের ধারা বন্ধ হয়নি। সেই সময়ের বর্বর ও নিষ্ঠুর সমাজের কাছে দুর্বোধ্য ও অবোধগম্য ভাষায় তিনি উচ্চারণ করেন—'বরং আমি আশা করি, মহান আল্লাহ তাদের উত্তরপ্রজন্ম থেকে এমন কিছু মানুষকে বের করে আনবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না।'[১]

সুবহানাল্লাহ, এ কেমন রুহ! এ কেমন আত্মা! যে মধুর প্রতিশোধের সময় ভাবছে আগামী দিনের কথা! চিন্তা করছে এমন অনস্তিত্বের কথা, যা আল্লাহ এখনো সৃষ্টিই করেননি!

নবিজি শুধু জীবিতদেরই ক্ষমা করেননি; বরং তার ক্ষমা ও দয়া জীবিতদের ছাড়িয়ে এমন মানুষের কাছেও পৌঁছেছে, যারা এখনো এ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠই হয়নি।

এরপর নবিজি মক্কার পানে পা বাড়ান। পথের ধারে পড়ে থাকা প্রতিটি পাথরও যেন বড় বড় চোখ করে এই মহান মানুষটিকে দেখছিল, যিনি তার সমস্ত ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে নিজের মাঝে দাফন করে অনন্য উচ্চতায় আসীন হয়েছেন।

প্রাণচাঞ্চল্যে মুখরিত মক্কায় ফিরে আসেন নবিজি। যদি মহান আল্লাহ উদার না হতেন, যদি এই মহান মানুষটির অন্তর উদার না হতো, তাহলে এখানে, এই মক্কায় এখন জীবনের কোনো কোলাহল থাকত না। আবু জাহলের অট্টহাসি, আবু লাহাবের মিথ্যাচার এবং উকবার বিদ্রুপের বাণে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার জন্য নবিজি আবার ফিরে আসেন।

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৭৯৫

Scanned with CamScanner

সর্বোত্তম পরিধেয়

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, তা পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করতে পারস্য সম্রাট কিসরার মতো দামি চুড়ি পরার প্রয়োজন নেই। দরকার নেই অসংখ্য গম্বুজ, প্রশস্ত দুয়ার আর মার্বেল পাথর খচিত চকচকে অলিন্দবিশিষ্ট সুউচ্চ আলিশান প্রাসাদের। মানুষ যেন তার বাণী গ্রহণ করে, তার সুন্নাহর ওপর আমল করে, তার ওপর অবতীর্ণ কুরআন পাঠ করে—সেজন্য এ সমস্ত চাকচিক্য আর জাঁকজমকের মোটেও দরকার নেই।

তার মুখমণ্ডল অধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন পড়ে না কোনো কৃত্রিমতা ও ঠাটবাটে পরিপূর্ণ বেশভূষার। তার উত্তম চরিত্রগুণ আর আপন আত্মার সমুজ্জ্বল আলোকরশ্মিই তার শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোত্তম পরিধেয়।

তার আপন যে আলোকরশ্মি, তাতে অতিরিক্ত ও বাড়তি কিছু যোগ করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। যেমনিভাবে কোনো বস্তুকে বাড়তি সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হলে তার মূল চেহারা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তেমনিভাবে আল্লাহপ্রদত্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সুষমা ও সৌন্দর্য, যে মাধুর্য ও মোহনীয়তা তাতে অতিরিক্ত তুলি ও কালির কোনো দরকার নেই।

সাহাবি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'একবার ফেরেশতা জিবরিল নবিজির কাছে বসে ছিলেন। সেই সময় নবিজি আসমানের দিকে তাকান। তিনি দেখতে পান একজন ফেরেশতা আসমান থেকে নেমে আসছেন। তখন জিবরিল

Scanned with CamScanner

আলাইহিস সালাম নবিজিকে বললেন, এই যে ফেরেশতা আসছেন, তিনি এই প্রথম দুনিয়াতে আসছেন। এরপর ফেরেশতাটি নেমে এসে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ, আপনার রব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন—আপনি কি একজন বাদশাহ ও নবি হতে চান, নাকি একজন বান্দা ও রাসুল হতে চান?' তখন জিবরিল নবিজিকে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ, আপনার রবের সামনে বিনয়ী হোন।' জবাবে আল্লাহর রাসুল বললেন, 'আমি চাই, আমার রব যেন আমাকে একজন বান্দা ও রাসুল বানান।'[১]

ফলে আল্লাহর রাসুল সারাজীবন রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন, সেই সাথে একজন সাধারণ বান্দার মতো আল্লাহর সাথে এবং তাঁর বড়ত্বের সাথে জুড়ে ছিলেন। দুনিয়ার সাথে, দুনিয়ার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির সাথে তার অন্তরের কোনো লেনদেন ছিল না।

কোথায় তিনি?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনোই চাইতেন না, মানুষ তাকে ভয় পাক। ফলে তার চরিত্রের এই দিকটির কারণে মানুষ তাকে আরও অধিক পরিমাণে ভালোবাসত ও সমীহ করত।

অনেক অপরিচিত মানুষ মাঝেমধ্যে মসজিদে ঢুকে আল্লাহর রাসুলকে খুঁজত। যেহেতু আল্লাহর রাসুলের বিশেষ কোনো বেশভূষা ছিল না, ফলে তারা 'মুহাম্মাদ কোথায়' বলে ডাকাডাকি শুরু করত।

নবিজি দুনিয়াবি পৃষ্ঠপোষকও গ্রহণ করতেন না, যা অনেকে অবস্থান ও পদমর্যাদার জন্য খুব দরকারি মনে করে। মনে করা হয়, পৃষ্ঠপোষকতা পদমর্যাদার সুরক্ষা নিশ্চিত করে কিংবা সম্মান বৃদ্ধি করে। কিন্তু আল্লাহর নবি তার অগ্রাধিকার ও গুরুত্বের থেকে এসব জিনিসকে ছাঁটাই করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া ন্যায় ও সুবিচার থাকলে এসবের মোটেও প্রয়োজন পড়ে না। ন্যায়, বিনয় ও সত্যবাদিতাই হলো পদ ও পদবির সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক।

বাহ্যিকভাবে সাহাবি আবু যার, উবাদা ইবনুস সামিত অথবা খাব্বাব ইবনুল

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ৭১৬০

Scanned with CamScanner

আরাতের সাথে আল্লাহর রাসুলের মাঝে কোনো ভিন্নতা ছিল না।

স্বাভাবিকভাবেই কোনো অপরিচিত আগন্তুক এসে আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারতেন না, কে সালমান আল-ফারসি, কে বিলাল ইবনু রাবাহ কিংবা কে সুহাইব আর-রুমি, আর কেই-বা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি এমন কিছুই পরতেন না, যাতে কোনো অপরিচিত পরিদর্শক তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করতে পারে, বুঝতে পারে, ইনিই আল্লাহর প্রেরিত রাসুল।

তবুও কোনো আগন্তুকের দৃষ্টি যখন তার চোখ ও পবিত্র মুখমণ্ডলে পড়ত, তখন এক বিশেষ পবিত্রতার অনুভূতিতে ছেয়ে যেত তার মন। সহসাই সে বুঝে ফেলত, ইনিই আল্লাহর রাসুল।

আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম প্রথমে একজন ইহুদি ছিলেন, পরবর্তী সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহর নবি যখন মদিনায় প্রথম আসেন, লোকজন তাকে দেখার জন্য তার আশপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তারা বলছিল, আল্লাহর রাসুল এসেছেন। সবার দেখাদেখি আমিও এলাম দেখতে। যখন আমি তার চেহারার দিকে তাকালাম, তখন স্পষ্টই বুঝে গেলাম, এ কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়!'[১]

ইনি ছিলেন একজন ইহুদি। অন্য সবার সাথে দেখতে এসেছিলেন মক্কা থেকে আসা নবুওয়াতের দাবিদার একজন মানুষকে। সেই মানুষটির দিকে তাকাতেই দেখলেন সত্যবাদীর চিহ্ন, মুমিনের ছাপ। তার মনে হলো, ইনি তো মিথ্যা বলতে পারেন না!

এটাই তো সেই মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্য, যা পদবিধারী ব্যক্তিদের প্রয়োজন। শোভাযাত্রা, মিছিল, আগেপিছে গাড়ির সমারোহ কিংবা আনুষ্ঠানিকতার চেয়ে এ ধরনের আখলাক হাজারগুণ বেশি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ।

সকল মানুষের নবি

নবিজি দুর্বলদের সাথে সর্বোচ্চ বিনয় অবলম্বন করতেন। সাহাবি আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'মদিনার সাধারণ কোনো দাসীও যদি আল্লাহর রাসুলের কাছে তার কোনো প্রয়োজনের কথা বলত, নবিজি তার কথাও মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।'[২]

---

[১] *জামি তিরমিজি* : ২৪৮৫

[২] *সহিহ বুখারি* : ৬০৭২

Scanned with CamScanner

মদিনার একজন সাধারণ দাসী আল্লাহর রাসুলের কাছে আসত, আর তিনি কোনো অনুচর ছাড়াই চলে যেতেন তার সাথে। (বিভিন্ন বর্ণনায় আছে, এই বাঁদির বোধ-বুদ্ধির কিছুটা অভাব ছিল।) এরপর সেই বাঁদিটি তার বিভিন্ন প্রয়োজন ও সমস্যার কথা আল্লাহর রাসুলকে জানাত। কিন্তু নবিজি তাকে এটা কখনোই বলতেন না, তোমার সমস্যা সমাধানের জন্য আবু বকরের কাছে যাও অথবা উমারের কাছে গিয়ে তোমার সমস্যার কথা বলো; বরং তিনি নিজে তার সাথে যেতেন এবং অনুপম দয়া ও বিনয়ের সাথে তার সব সমস্যার কথা শুনে সেগুলো সমাধান করে দিতেন।

নিম্নমানের শক্ত কাপড়

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিধানের ক্ষেত্রে খুবই সাদামাটা পোশাক পছন্দ করতেন। দৃষ্টিনন্দন, মানুষের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করার মতো কোনো পোশাক তিনি পরতেন না; বরং যেসব কাপড়ে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন, সবসময় সে রকম পোশাকই খুঁজে নিতেন। মহান আল্লাহ তাকে রিসালাতের যে মহান দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তিনি সবসময় সেদিকেই তার অন্তর ও দৃষ্টিকে স্থির রাখতেন।

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার আল্লাহর রাসুল চারকোনা একটি রঙিন নকশাদার কাপড়ে সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে তিনি বললেন, তোমরা আমার এই নকশি কাপড়টি নিয়ে আবু জাহামের কাছে নিয়ে যাও। আর তার কাছ থেকে আমার জন্য একটি 'আনবাজানি'[১] কাপড় নিয়ে আসবে। কেননা, রঙিন এই কাপড় সালাতে আমাকে কিছু সময়ের জন্য অন্যমনস্ক করে দিয়েছিল।'[২]

আল্লাহর রাসুল পশমের তৈরি মোটা ও শক্ত কাপড় নিজের জন্য পছন্দ করেছেন এবং সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন নকশাদার রঙিন কাপড়ের ওপর একে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, এই সাদামাটা কাপড় তার রবের সাথে নিভৃত আলাপনে মনোযোগ নষ্ট করে না। আর নবিজির কাছে এই জীবন তো সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রদর্শনের কোনো মঞ্চ নয়; বরং এই জীবন আল্লাহর পথে চলার এক ময়দান। ফলে যতদিন তার রুহ দুনিয়াতে

---

[১] পশমের তৈরি একধরনের অনুন্নত মোটা কাপড়।

[২] *সহিহ বুখারি* : ৩৭৩

Scanned with CamScanner

সচল ছিল, ততদিন তিনি শক্ত-মোটা, জীর্ণশীর্ণ ও পুরাতন পোশাক পরে গেছেন।

সাহাবি আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসুলের সাথে হাঁটছিলাম, আর তার গায়ে ছিল একটি নাজরানী (শক্ত প্রান্তবিশিষ্ট চাদর)।'[১]

নবিজি যদি ইচ্ছা করতেন আর আল্লাহর কাছে দুআ করতেন, তবে তো দুনিয়ার সকল রাজা-বাদশার চেয়েও উত্তম পোশাক পরতে পারতেন। মহান আল্লাহ বলেন—

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾

.....

বরকতময় সেই সত্তা, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে এরচেয়ে উত্তম বস্তু দিতে পারেন—বাগ-বাগিচা, যার তলদেশ দিয়ে বয়ে চলে নহরসমূহ এবং তিনি দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ।[২]

.....

এতকিছু সত্ত্বেও নবিজি পরিধান করতেন শক্ত প্রান্তবিশিষ্ট চাদর, সাধারণ নাজরানী কাপড়।

এই নাজরানী চাদর আমাদের আরও স্মরণ করিয়ে দেয় শামদেশীয় সেই জুব্বার কথা, যে বিষয়ে মুগিরা ইবনু শোবা আমাদের জানিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেন, 'নবিজির পরনে একটি শামদেশীয় জুব্বা দেখা যেত। একবার তিনি অজু করার জন্য জুব্বাটির হাতা গুটিয়ে তার পুরো হাত বের করতে চাইলেন। কিন্তু হাতাটি ছিল খুবই সংকুচিত। ফলে তিনি জুব্বার নিচ দিয়ে হাত বের করলেন।'[৩] 'হাতাটি ছিল খুবই সংকুচিত' কথাটির দিকে আরেকবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন এবং নিজেকে প্রশ্ন করুন, কখন এবং কেন আপনার জামা এত বেশি সংকুচিত হয়ে পড়ে যে, আপনি অজু করার জন্য হাত বের করতে পারেন না, যে কারণে জামার নিচ দিয়ে হাত বের করতে হয়?

যখন আপনি অনুভব করবেন, আপনার মাঝে সরলতা, অকপট অকৃত্রিমতার শীতল বাতাস বয়ে যাচ্ছে, আর তা সমস্ত নকল জিনিসকে সমূলে উপড়ে ফেলছে এবং

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৩১৪৯; *সহিহ মুসলিম* : ১০৫৭

[২] সুরা ফুরকান, আয়াত : ১০

[৩] *সহিহ বুখারি* : ৩৬৩; *সহিহ মুসলিম* : ২৭৫

Scanned with CamScanner

অহংকার ও ঔদ্ধত্যের বিনাশ সাধন করছে, তখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবেন, আপনি আল্লাহর প্রেরিত শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথেই আছেন।

নিখাদ মাটির এক মানুষ

সহিহ বুখারির একটি হাদিস পড়তে গিয়ে থমকে যেতে হলো। বিশেষত হাদিসের প্রথম অংশ। হাদিসটির শুরুর দিকটা এখানে উল্লেখ করছি। সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'একবার আমি এবং আল্লাহর রাসুল মদিনার পরিত্যক্ত একটি স্থান (ভাগাড়) দিয়ে হাঁটছিলাম। আর তিনি একটি খেজুরের ডালের ওপর ভর দিয়ে ছিলেন...।'[১]

চিন্তা করে দেখুন, নবিজি বিন্দুমাত্র অহংকার আর আত্মগৌরবের ধার না ধেরে এ রকম আবর্জনায় ভর্তি জায়গাগুলোতেও পরম বিনয় ও নম্রতার সাথে হাঁটছেন। তার পবিত্র পায়ের জন্য তিনি কোনো উন্নত রাস্তা খোঁজেননি। মানুষের সামনে তার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য লাল গালিচায় হেঁটে, আশপাশে ফরাসি কার্পেট বিছিয়ে কিংবা সামনে পেছনে পাইক-পেয়াদা নিয়ে উন্নত সুগন্ধির ধুপদানি উড়িয়ে চলেননি।

মদিনার কালো পাথর আর গজিয়ে ওঠা ঘাস তার কাছে লাল গালিচার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় ছিল। মদিনার পবিত্র মাটির সুগন্ধি তার কাছে রাজকীয় সুবাসদানি থেকেও বেশি প্রিয় ছিল।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তিনি, কিন্তু কী অনন্য উচ্চতা আর মাহাত্ম্য নিয়ে অবলীলায় হেঁটে যেতেন সাধারণ থেকে অতি সাধারণ স্থানে! মাহাত্ম্য আর শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ তো এটা নয় যে, ভীতি ও সমীহের কৃত্রিম দেওয়াল তৈরি করতে হবে কিংবা আশপাশের লোকজনকে হাঁকডাকে ভীত-সন্ত্রস্ত্র করে তুলতে হবে। অথবা আমি কী পরব, কীসে চড়ব, কোথায় যাব, কীভাবে কথা বলব—এ জাতীয় বাগাড়ম্বর দেখিয়ে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে ছাড়ব।

মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তো বাস করে সারল্যে, স্বাভাবিকতায়, সাদামাটা ব্যবহারে। আল্লাহর নবি পুরো বিশ্বকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন এভাবেই।

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ১২৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৭৯৪

Scanned with CamScanner

যেন তিনি সাধারণ কেউ

জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে মানবতার এক পূর্ণাঙ্গ রূপে বিরাজমান ছিলেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার চরিত্রের এমন কোনো দিক কেউ বের করতে পারবে না, যা মানবতার বাইরে। মূলত মহান আল্লাহই চেয়েছেন, তাঁর রাসুল যেন হন একজন সাধারণ মানুষ, তাঁর বান্দা, 'যিনি খাবার-পানীয় গ্রহণ করেন এবং হাট-বাজারে গমন করেন।'

দয়ার ক্ষেত্রে, সাহসিকতা ও শৌর্যবীর্যের ক্ষেত্রে, ক্রোধ ও সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে, সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মানবতার এক সুউচ্চ নিদর্শন।

জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে তিনি বারবার প্রমাণ করেছেন, তিনি একজন সাধারণ মানুষ। আর সবার মতোই তার মাঝে রাগ, আনন্দ ও ঘৃণার অনুভূতি বিদ্যমান। কিন্তু তার খুশি ও আনন্দ, ঘৃণা ও রাগ, দুঃখ ও যন্ত্রণা—সবকিছুতেই একটা অন্যমাত্রা ছিল, ছিল ভিন্ন প্রকাশভঙ্গি।

'আমরা আমাদের জাগতিক প্রয়োজন পূরণ করব, আমাদের স্বাভাবিক অকৃত্রিম আবেগানুভূতি থেকে পালিয়ে থাকব না, কিন্তু আমরা যেন নিজেদের জন্য কল্পিত কোনো মূর্তি তৈরি না করি এবং সেটার পূজা-অর্চনা না করি'—এটাই ছিল তার মানবতার বার্তা।

জীবনের স্বাভাবিক দাবি অনুসারে না চললে সে জীবন প্রাণবন্ত হতে পারে না। যখন প্রয়োজন হবে, আপনি হাসবেন, কাঁদবেন, বিস্ময় প্রকাশ করবেন, কখনো বা ভয়ে

Scanned with CamScanner

কেঁপে উঠবেন। আপনি এমন মানুষ হবেন, এক দিকে জীবন যাকে নিজের মতো করে পরিচালিত করবে, আরেক দিকে জীবনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন আপনার ভেতরে থাকা রুহের মাধ্যমে। এটাই চাইতেন নবিজি। এমনই ছিল তার জীবনদর্শন।

যখন তিনি কেবলই মানুষ

নবিজির আদরের মেয়ে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার স্বামী আলি ইবনু আবি তালিব সিদ্ধান্ত নেন তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করবেন। আর সেই পাত্রীটি হলেন ইসলামের প্রথম দুশমন আবু জাহলের কন্যা।

বিষয়টা এমন ছিল, যেখানে ধর্মীয় বিবেচনায় কোনো বাধা বা সমস্যা নেই। একজন পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতেই পারেন। কিন্তু আল্লাহর রাসুলের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছে, তিনি ক্রুদ্ধ হন। এটা ছিল সাধারণ মানবীয় ক্রোধ। এরপর আল্লাহর রাসুল ঘোষণা করেন, 'আল্লাহর রাসুলের কন্যার সাথে আল্লাহর দুশমনের কন্যা কখনো একসাথে থাকতে পারে না।'[১]

উক্ত ঘোষণার সাথে আল্লাহর রাসুল এটাও উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, তিনি কোনো হারাম কাজকে হালাল ঘোষণা করছেন না, একইভাবে কোনো হালাল কাজকেও হারাম বলে ঘোষণা দিচ্ছেন না। কেননা, বিষয়টি একান্তই ব্যক্তিগত। এটি তার নবুওয়াতের সাথে যতটা সম্বন্ধযুক্ত, তারচেয়ে বেশি সম্পৃক্ত তার পিতৃত্বের সাথে।

সত্যিই আমরা বড় মুশকিলে পড়ে যেতাম, যদি আল্লাহ কোনো ফেরেশতাকে আমাদের নবি হিসেবে প্রেরণ করতেন। আমাদের আবেগানুভূতি, মানবীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, স্বভাব-প্রকৃতি কিছুই তিনি বুঝতেন না তখন।

এ কারণেই মহান আল্লাহ তাঁর নবির জন্য এটাই ফায়সালা করেছেন, যেন তিনি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে মানুষের মাঝে বাস করেন। কোনো ফেরেশতা বা অতিমানবীয় রূপে নয়। যাতে আমরা তার অনুসরণ করতে পারি এবং বুঝতে পারি, সাধারণ মানবীয় আবেগানুভূতিও কী করে এতটা প্রজ্বলিত হতে পারে, এতটা উৎকর্ষ সাধন করতে পারে।

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৩১১০; *সহিহ মুসলিম* : ২৪৪৯

Scanned with CamScanner

তিনি হলেন একজন মহান নবি, একইসাথে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। মহান আল্লাহ তাকে এজন্য প্রেরণ করেননি যে, তিনি মানব-হৃদয়ের যাবতীয় স্বাভাবিক গুণাগুণের প্রবাহ রুদ্ধ করে দেবেন, যাতে কেউ ক্রুদ্ধ হতে না পারে, ভালোবাসতে না পারে, কাঁদতে না পারে, হাসতে না পারে। না, আল্লাহ এজন্য নবিজিকে প্রেরণ করেননি; বরং তিনি এসেছেন মানুষকে শেখাতে, কীভাবে সংযমের সাথে কাঁদতে হয়, কীভাবে নম্রভাবে হাসতে হয়, কেমন মহানুভবতায় ভালোবাসতে হয়।

এভাবেই নবিজি মানুষকে শিখিয়ে গিয়েছেন, পার্থিব চরিত্র-স্বভাবের সাথে কীভাবে আসমানি মূল্যবোধ আর চেতনার সমাবেশ ঘটাতে হয়। দুনিয়া ও আসমানের এমন সংমিশ্রণই তো সবচেয়ে উত্তম ও মহান মানুষের জন্ম দেয়।

মানবীয় আচরণ ও একজন নবিজি

উহুদের যুদ্ধে হামজা রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর তার ইয়াতিম কন্যার অভিভাবকত্ব নিয়ে দুই ভাই আলি ও জাফরের মাঝে অমিল দেখা দেয়। ইয়াতিমের অভিভাবকত্ব গ্রহণে দুজনেই সমান আগ্রহী। কে বেশি হকদার তা জানার জন্য তারা আল্লাহর নবির কাছে গেলেন। নবিজি জাফরের যুক্তিকে গ্রহণযোগ্য মনে করে ইয়াতিমের দায়িত্ব তার কাছে অর্পণ করে দেন।

জাফর তখন কী করেছিলেন জানেন?

খুশিতে তিনি একপায়ে দাঁড়িয়ে নবিজির চারপাশে ঘুরে ঘুরে বিশেষ পদ্ধতিতে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু নবিজির কাছে এই আচরণ একটু অদ্ভুত ঠেকে। তিনি এর ব্যাখ্যা জানতে চান জাফরের কাছে। জাফর নবিজিকে জানান, এটি হচ্ছে আনন্দ প্রকাশের একটি স্বাভাবিক রীতি, যা হাবশার লোকেরা খুশির মুহূর্তে করে থাকে।[১]

সে সময় নবিজি জাফরের সেই স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম মানবীয় অনুভূতিতে আঘাত করেননি, যা তিনি হাবশা দেশীয় কাফিরদের রীতিনীতি থেকে গ্রহণ করেছেন; বরং একে তিনি অভ্যাসগত স্বাভাবিক আচরণ হিসেবেই মেনে নিয়েছেন। এমনকি এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য পর্যন্ত করেননি। এ ধরনের পরিস্থিতিগুলোতে বরং কখনো কখনো নবিজির মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠত।

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ২২৮০

Scanned with CamScanner

উল্লিখিত ঘটনার বর্ণনায় এসেছে, নবিজি জাফরের দু-চোখের মাঝখানে চুম্বন করেন এবং বলেন, 'জাফর, তুমি গঠন-আকৃতি ও স্বভাব-চরিত্রে আমার সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ।'

ভয়ের কাঁপুনি

আমরা ইতঃপূর্বে আল্লাহর রাসুলের সাহসের কথা, তার নির্ভীকতা ও ভয়শূন্যতার কথা জেনেছি। কিন্তু মহান আল্লাহ একরাতে নবিজির মনের মধ্যে একধরনের শূন্যতা ও নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি সৃষ্টি করে দেন, যাকে আমরা ভয়ভীতি বলি। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, 'একরাতে আল্লাহর রাসুলের ঘুম আসছিল না। বললেন, আমার সাহাবিদের কেউ যদি আজ রাতে আমার পাহারায় নিয়োজিত থাকত! আয়িশা বর্ণনা করেন, এরপর আমরা ঘরের বাইরে অস্ত্রের আওয়াজ শুনতে পাই। আল্লাহর রাসুল জানতে চাইলেন, কে এসেছে? তখন বাইরে থেকে সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের আওয়াজ ভেসে আসে—ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি। আপনার পাহারার জন্য এসেছি। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, এরপর আল্লাহর রাসুল ঘুমিয়ে পড়েন, এমনকি আমি তার নাক ডাকার শব্দও শুনতে পাই।'[১]

যদি সেই রাতে আল্লাহর রাসুলের মনে ভয়ের অনুভূতি সৃষ্টি না হতো, তাহলে আমরা বুঝতেও পারতাম না এমন অনুভূতি কতটা স্বাভাবিক, কতটা সহজাত। অন্যের মানবীয় ভয়ভীতির সময়ে না জানি কেমন আচরণ করতাম আমরা। কেউ নিজের মনে জেঁকে বসা ভয়ের কথা জানাতেও পারত না। তাকে নিয়ে কত তুচ্ছতাচ্ছিল্যই না করা হতো!

নবিজি ছিলেন রক্তে মাংসে গড়া, আমাদের মতোই একজন মানুষ। তার মনে উদিত হওয়া সেই ভয়ের সময় তিনি একজন মানুষের মতোই আচরণ করেছেন, যাতে কেউ ভয়ের কথা প্রকাশ করলে আমরা নিন্দা না করি। যাতে আমাদের ভয় ও শঙ্কার সময়ে, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় অশ্রুপাতের সময়ে, অতি পবিত্রতার ভেকধারী কেউ এসে আমাদের তিরস্কার ও নিন্দা করতে না পারে, ভীতু ও কাপুরুষ বলে বিদ্রুপের বাণে ঘায়েল করতে না পারে।

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ১১৭; *সহিহ মুসলিম* : ২৪১০

Scanned with CamScanner

কঠিন এক সমীকরণ

নবিজি এই জীবনকে কোনো মসজিদ ভাবতেন না। মনে করতেন না, এখানে শুধু যিকির করা হবে, কেবল সালাত-সাওম হবে; বরং নবিজির কাছে ইবাদতের অর্থ ছিল আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। তিনি এসেছিলেন 'ইবাদত' শব্দের অর্থকে সালাত-সাওমের সীমানার চেয়ে আরও বড়, আরও ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে।

তার মতে, ইবাদত হচ্ছে, সেভাবেই জীবনযাপন করা, যেভাবে মহান আল্লাহ চান। ইবাদত হচ্ছে সালাত আদায় করা, সাওম পালন করা, আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা, নিদ্রা যাওয়া, পানাহার করা, এমনকি হাসিমুখে কথা বলাও একপ্রকার ইবাদত। ইবাদতের অর্থ এই নয় যে, আপনি একজন ফেরেশতা হয়ে যাবেন; বরং আপনি হবেন একজন মানুষ, যে মসজিদে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হবে, আবার অন্যদিকে পরিবার-পরিজনের সাথে আনন্দ-বিনোদনেও অংশ নেবে।

সাহাবি উসমান ইবনু মাযঊন রাতদিন ইবাদতে মশগুল থাকতেন। নিজেকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নির্জনে আল্লাহর ইবাদত করতেন। নবিজি তার কাছে গিয়ে বললেন, 'হে উসমান, মহান আল্লাহ আমাকে সন্ন্যাসবাদ দিয়ে পাঠাননি। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম দ্বীন হচ্ছে সরল-সোজা ইসলাম।[১]

সুতরাং আপনি যদি সরল-সোজা ইসলামের অনুসারী হতে চান, তবে ইবাদতের সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

নবিজি তার সারা জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজের মাধ্যমে তার সাহাবিদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন।

তোমাকে আমি আর দেখতে চাই না

সীরাহ-গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করেন, হামজা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘাতক ওয়াহশি মুসলিম হয়ে মদিনায় এলে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে ফেলেন। জিজ্ঞেস করেন, 'কে? ওয়াহশি নাকি?'

ওয়াহশির হ্যাঁ-সূচক জবাবে নবিজি বলেন, 'বসো, আমার চাচাকে কীভাবে হত্যা

---

[১] *সিলসিলাহ সহিহাহ* : ১৭৮২

Scanned with CamScanner

করেছ আমাকে বলো।' ওয়াহশি সে ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

এবার আল্লাহর রাসুল তাকে বলেন, 'আজ থেকে তোমার চেহারা আমাকে আর দেখাবে না। আমি যেন তোমাকে আর না দেখি।' এরপর থেকে আল্লাহর রাসুলের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি যেখানে থাকতেন, সেদিকে না গিয়ে ওয়াহশি অন্যপথ ধরতেন।[১]

হামজার শহিদ হওয়ার বিস্তারিত ঘটনা ছিল খুবই বেদনাদায়ক। হামজা ছিলেন ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। তার ইসলামগ্রহণ ছিল ইসলামের জন্য বিজয় ও মর্যাদার বিষয়। আল্লাহর রাসুলের হৃদয়ে কেমন রক্তক্ষরণ হচ্ছিল যখন তিনি ওয়াহশির কাছে আপন চাচা হামজার নিহত হওয়ার ঘটনা শুনছিলেন? তার ধমনি-শিরার রক্ত কি ছলকে উঠেছিল এই হৃদয়বিদারক ঘটনা শোনার সময়?

'না, আমি তোমাকে আর দেখতে চাই না। তুমি কখনোই আমার মুখোমুখি হবে না। যাতে আমার মনে একজন ঘাতকের আঘাতে তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা প্রিয় হামজার চেহারা ভেসে না ওঠে। হোক সেটা যুদ্ধের ময়দানে! আহ হামজা! প্রিয় চাচা!

হায় ওয়াহশি, আমাকে বজ্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত কোরো না, আবার আমার কাছেই বৃষ্টি চাইতে এসো না!'

নবিজি হয়তো ওয়াহশিকে এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

নবিজি তার হৃদয়ে ঝড় তোলা সেই অসহনীয় আবেগকে দমাতে যাননি। ক্ষমা, দয়া, মানসিক প্রশান্তি এবং আত্মসন্ধির প্রসঙ্গ টেনে ওয়াহশিকে থামিয়ে দেননি; বরং তাকে বলতে দিয়েছেন। যাতে আমরা এই বিষয়টি শিখতে পারি যে, আমি ভালো মানুষ এবং একইভাবে আমি যথোপযুক্ত কারণে রাগও করি—এই দুই অবস্থার মাঝে কোনো বিরোধ নেই। আমি সাধ্যানুযায়ী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করছি। আমার সব ধৈর্য দিয়ে আমার ক্রোধের ওপর সংযমের লাগাম পরিয়ে রেখেছি। কিন্তু কোনো একদিন হয়তো এই ধৈর্য ফুরিয়ে আসবে, সেদিন আমাকে তিরস্কার করো না। কেননা, আমিও একজন রক্ত-মাংসের মানুষ!

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৪০৭২

Scanned with CamScanner

ফেরেশতার ছোঁয়া

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের গুণের মূল্যায়ন করতেন। মহান আল্লাহ তার আশপাশের যাকে যে ধরনের গুণ দিয়েছিলেন, তিনি সেসবের খুব কদর করতেন, গুরুত্ব দিতেন। মানুষকে তিনি শেখাতে চেয়েছিলেন, গুণের গুরুত্ব রয়েছে। কোনো মন্তব্য ছাড়া তা এড়িয়ে যাওয়াটা অসৌজন্যমূলক।

একরাতে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা দেরি করে ঘরে ফেরেন। নবিজি তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যখন আয়িশা ফিরে এলেন, আল্লাহর রাসুল তার কাছে দেরির কারণ জানতে চাইলেন। মা আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জানালেন, 'মসজিদে একজন লোক আছে। আমি তারচেয়ে সুন্দর তিলাওয়াতের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি।'[১]

নবিজি তো গুণের মূল্যায়ন করতেন! তিনি চাদর গায়ে জড়িয়ে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদের দিকে ছোটেন। নবিজি জানতে চান, কে এমন সুন্দর তিলাওয়াতের অধিকারী? মদিনার বাতাসে সেই তিলাওয়াতের সুর ঝরে ঝরে পড়ছিল। আওয়াজ ধীরে ধীরে আরও স্পষ্ট হতে থাকে। তিনি চিনে ফেলেন সেই সুরের মালিককে।

না চেনার কোনো কারণ তো নেই। ইনি তো মক্কায় দারুল আরকামের সাথি, প্রথম দিককার একজন মুসলিম। আয়িশার বর্ণনামতে, নবিজি দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে সেই তিলাওয়াত মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করেন, এরপর বাড়ি ফিরে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জানান, এই তিলাওয়াতকারী হচ্ছেন আবু হুযাইফার মুক্ত দাস সালিম। অতঃপর আল্লাহর রাসুল বলেন, 'সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে তার মতো মানুষকে রেখেছেন।'

একবার তিনি সাহাবি আবু মুসাকে বললেন, 'যদি গতরাতে তুমি আমায় দেখতে, যখন আমি তোমার তিলাওয়াত শুনছিলাম! তোমাকে দাউদ বংশের সুরেলা কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে।'[২]

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৫৩২০

[২] *সহিহ বুখারি* : ৫০৪৮; *সহিহ মুসলিম* : ৭৯৩

Scanned with CamScanner

প্রেরণার বাতিঘর

নবিজির সাথে সাহাবিদের সম্পর্ক ছিল ঠিক যেন পিতা-পুত্রের মতো। কিংবা বলা যায়, তিনি ছিলেন একজন প্রেরণাদায়ী শিক্ষকের মতো, যিনি এক-এক করে তার প্রতিটি সাহাবিকে নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন, চিন্তা করতেন। প্রত্যেকের দক্ষতা ও ক্ষমতার ক্ষেত্র নির্ণয় করে তাদের সর্বোচ্চ প্রেরণা জোগাতেন। তাদের সামর্থ্য ও সক্ষমতা এমনভাবে জাগিয়ে তুলতেন যে, তা পরিণত হতো বাঁধভাঙা এক প্রবল শক্তিতে।

কোনো সাহসী ঘোড়সওয়ারকে দেখলে তিনি জানিয়ে দিতেন, তার সাহসিকতার তুলনা নেই, বিরল। এটা শুনে তার মনোবল বেড়ে যেত বহুগণ। এরপর শিকারী সিংহের মতো হুংকার ছেড়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ত ইসলামের শত্রুদের ওপর।

কোনো প্রতিভাবান কবিকে দেখলে তিনি বলতেন, 'তোমার রচিত একটি পঙ্‌ক্তির বিষয়ে আসমান-জমিনের মালিকের পক্ষ থেকে বিশেষ শুকরিয়াবার্তা এসেছে।' এরপর দেখা যেত, সেই কবির রচিত প্রতিটি হরফ আগুনের গোলা হয়ে বর্ষিত হতো আল্লাহর দুশমনদের ওপর। আর তাদের আরামের ঘুম এক নিমিষেই হারাম হয়ে যেত।

কিংবা হৃদয়গ্রাহী বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের কোনো ক্বারীর ব্যাপারে জানলে তার বাড়িতে গিয়ে কুরআনের কিছু অংশ শিখিয়ে আসতেন। কিছুদিন পর দেখা যেত সেই ক্বারীই পরিণত হয়েছেন সময়ের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ক্বারীতে।

Scanned with CamScanner

এভাবেই নবিজি তার আশপাশের মানুষগুলোর হৃদয়ে অনুপ্রেরণার বীজ বুনে দিতেন। এভাবেই তিনি সংকীর্ণ অলিগলি থেকে তাদের বের করে আনতেন খোলা রাজপথে। চালিতের স্থান থেকে নিয়ে আসতেন চালকের মর্যাদায়। তাদের সক্ষমতা ও প্রতিভাগুলোকে ব্যক্তিগত গণ্ডি থেকে বের করে আনতেন সভ্যতার গঠন ও নির্মাণের নতুন এক দিগন্তে।

এভাবে তিনি সবাইকে দৈনন্দিন অভ্যাসের খাঁচা থেকে বের করে শ্রেষ্ঠত্বের পোশাক পরিয়েছিলেন।

কবি বড় সত্য বলেছেন—

নবির কাছে তোমরা কীসের মুজিযা খুঁজে ফেরো?
মৃত জনগোষ্ঠীর নতুন জীবনই তো তার অমর মুজিযা!

কবি?

সিয়ারু আলামিন নুবালা গ্রন্থের একটি ঘটনা। ঘটনাটি পড়ে বোঝা যায়, সাহাবিদের অন্তরে বিদ্যুৎ চমকানোর, আশ্চর্য ঢেউ তোলার কী অসীম ও অভাবনীয় শক্তি ছিল নবিজির!

নবিজির হিজরতের আগে মদিনা থেকে একটি হজ-কাফেলা মক্কার দিকে রওনা হয়েছিল। সেই কাফেলায় ছিলেন মহান গোত্রপতি বারা ইবনু মা'রুর রাযিয়াল্লাহু আনহু। কাফেলা যখন মক্কায় গিয়ে পৌঁছল, তখন বারা রাযিয়াল্লাহু আনহু কিছু একটা জিজ্ঞেস করার জন্য আল্লাহর রাসুলের কাছে আসতে চাইলেন। বারা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ভাতিজা কাব ইবনু মালিককেও সাথে নিলেন। (কাব ছিলেন একজন কবি)

মসজিদে পৌঁছে আল্লাহর রাসুলকে খুঁজছিলেন তারা। এই দুজন আগে কখনো আল্লাহর রাসুলকে দেখেননি। তাই এক লোকের কাছে জানতে চাইলেন, 'নবিজি কোথায় আছেন বলতে পারো?' জবাবে লোকটি বলল, 'আপনারা কি আব্বাসকে চেনেন?'

তারা দুজনই আব্বাসকে চিনতেন, ফলে লোকটি তাদের জানিয়ে দিলো, আল্লাহর রাসুল মসজিদে আব্বাসের সাথে বসে আছেন।

Scanned with CamScanner

লোকটির কথা শুনে মসজিদে ঢুকলেন তারা। আব্বাসকে দেখতে পেলেন, তার পাশে নবিজিকেও দেখলেন। সালাম দিলেন আল্লাহর রাসুলকে। নবিজি আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি তাদের চেনেন?' আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হ্যাঁ, চিনি। ইনি বারা ইবনু মা'রুর আর ইনি কাব ইবনু মালিক।'

কাব ইবনু মালিকের পরিচয় দেওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহর নবি বললেন, 'কবি কাব নাকি?' পরবর্তী সময়ে কাব বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসুলের সেই কথাটি (কবি কাব নাকি) কখনোই ভুলব না!'[১]

কী অপূর্ব সম্বোধন নবিজির! আকাশের বজ্র সেসব শব্দমালা লিখে নিতে বলে, বৃষ্টি তা আপন স্নিগ্ধতায় টুকে নেয়! সেই শব্দমালা 'কবি কাব নাকি' উচ্চারণের পর আমি যেন অনুভব করছি ঝিরিঝিরি বাতাসের হালকা বৃষ্টির ছোঁয়া, যা শীতল মেঘমালার ঘ্রাণ ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে। আর কাব ইবনু মালিকের অন্তর ভরে গিয়েছে সেই সুঘ্রাণে!

একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত উচ্চারণেই তিনি এমন প্রভাব ও সম্মোহন তৈরি করতে পেরেছিলেন, যা কাব ইবনু মালিকের আপন ইতিহাস ও সারা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল।

নবিজি যেন মক্কায় বসেই মাদানি জীবনের চিন্তা-পরিকল্পনার ছক কষে ফেলেছিলেন। যেন তিনি ভাবছিলেন, আগত সময়ে কিছুসংখ্যক কবির প্রয়োজন হতে পারে ইসলামের, যারা ইসলামি চিন্তা ও সংস্কৃতির পুনর্গঠনের জন্য কাজ করবে এবং জাহেলি যুগের অশ্লীল ও আবর্জনাপূর্ণ চিন্তা ও কবিতার বিপরীতে ইসলামি মূল্যবোধ ও চিন্তাসমৃদ্ধ কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করবে। ফলে নবিজি সেই সামান্য প্রাসঙ্গিকতা ও সুযোগটিও হাতছাড়া করলেন না। ফলে কাব ইবনু মালিককে উন্নীত করলেন সাধারণ এক কবিসত্তার স্তর থেকে প্রভাবশালী এক কবিসত্তায়।

প্রিয় নবিজির ব্যক্তিত্বের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দিকটি হলো সুপ্ত প্রতিভা, যোগ্যতা ও উপাদানের সঠিক নির্ণয়। তিনি অন্য এক উচ্চতা থেকে মানুষের ভেতরে থাকা শ্রেষ্ঠত্বের গুণটি সহজেই ধরতে পারতেন। এরপর গুরুত্ব প্রদান, প্রশংসা, কোনো সুন্দর মন্তব্য অথবা সাধারণভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেই

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৫৭৯৪; ইমাম যাহাবি ঘটনাটি সাহাবি বারা ইবনু মারের জীবনীতে উল্লেখ করেন।

Scanned with CamScanner

তাদের এমন এক মহান মানুষে রূপান্তরিত হবার অনুপ্রেরণা দিতেন, যা হৃদয়ে জ্বলজ্বল করত যুগ যুগ ধরে।

কাব্যের মিম্বার

যেহেতু কবিতার প্রসঙ্গ এসেছে, আমরা একটু ঘুরে আসি কাব্যপ্রতিভার অনন্য নিদর্শন, সত্যের আওয়াজ বুলন্দকারী কবিসত্তার আলোচনা থেকে। নবিজি সেই মানুষটার প্রতিভা ও যোগ্যতায় কী এমন পরিবর্তন করেছিলেন, কী করে তার কাব্যপ্রতিভার পুনর্গঠন করে তাকে আপন ভুবনে অতুলনীয় করে তুলেছিলেন তার বৃত্তান্ত জেনে আসি।

নবিজি মদিনায় আসেন। তার আশপাশে কতশত নতুন মুখ, কত বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিভার অধিকারী একেকজন। এদের নতুনরূপে গড়ে তুলতে হবে, নতুন রূপ ও চেহারায় পুনর্গঠন করতে হবে। দ্বীন ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত করার জন্য এদের আবদ্ধ বলয় থেকে বের করে উপস্থাপন করতে হবে পৃথিবীর সামনে। এদের প্রদীপ্ত প্রতিভায় ধার দিয়ে আরও উজ্জ্বলরূপে তুলে ধরতে হবে মুসলিমদের কল্যাণে।

তিনি দেখলেন কবি হাসসান ইবনু সাবিতকে, জাহেলি যুগেই যার কাব্যপ্রতিভা স্ফটিকস্বচ্ছ হয়ে ধরা দিয়েছিল সকলের সামনে। নবিজি তাকে উটনীর গুণগান, প্রিয়তমার স্তুতি আর পুরোনো দিনের স্মৃতি-রোমন্থন থেকে বের করে নিয়ে এলেন। আর পরিণত করলেন এমন কাব্যযোদ্ধা রূপে, যিনি মক্কার কাফিরদের মানসিক অহংবোধের সুউচ্চ অট্টালিকা চুরমার করে দিতেন। কিন্তু নবিজি কীভাবে করলেন এই পরিবর্তন?

নবিজি একবার মদিনার মুসলিম কবিদেরকে মক্কার কাফিরদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ-কাব্য পাঠ করার নির্দেশ দেন। যেন শব্দের তির হয়ে সেসব কথামালা বিদ্ধ করে শত্রুর অন্তরকে। একে একে অনেক কবি এলেন। কিন্তু আল্লাহর নবি কারো কাব্যেই বিদ্রুপের সেই ঝাঁজটুকু পাচ্ছিলেন না, যা তিনি চাচ্ছিলেন। নবিজিই সবচেয়ে ভালো জানতেন, কোন কথায় তাদের অন্তরে আগুন জ্বলবে। কিন্তু কারো কবিতাই নবিজির সেই উদ্দেশ্যের সাথে মিলছিল না।

এরপর নবিজি হাসসানকে ডেকে পাঠান। হাসসান রাযিয়াল্লাহু আনহু আসেন খাপখোলা তরবারির মতো উন্মুক্ত জিহ্বা নিয়ে। তিনি এসে এমন এক ধারালো

Scanned with CamScanner

কবিতা পাঠ করে শোনান, যা শত্রুর অন্তর কেটে ফালাফালা করে দেয়, মক্কার কুরাইশদের অন্তরে তিরের ফলার মতো ঢুকে পড়ে। তখন নবিজি হাসসানের প্রশংসায় বললেন, 'হাসসান তাদের উদ্দেশ্যে বিদ্রুপকাব্য পাঠ করেছে, সে সবার তৃষ্ণা মিটিয়েছে, সে নিজেও পরিতৃপ্ত হয়েছে।'[১]

দিন যেতে থাকে। একসময় নবিজি তার বিশেষ মিম্বার হাসসানের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। হাসসান ছাড়া আর কারো জন্য এর ওপর ওঠার অনুমতি ছিল না! নবিজি হাসসানকে বলতেন, 'হাসসান, তোমার বিদ্রুপকাব্যে তাদের বিদ্ধ করো, রুহুল কুদুস (জিবরিল) তোমাকে সাহায্য করবেন!'

শক্ত ও পাথরকঠিন অন্তরসমূহকে পুনর্নির্মাণ করা অনেক কঠিন একটি কাজ। এজন্য প্রয়োজন ইস্পাতদৃঢ় হৃদয় আর শক্ত মনোবলের অধিকারী মানুষ। আর কোনো সন্দেহ নেই, আল্লাহর রাসুল সেইসব প্রভাবশালী মানুষের সর্দার।

নবি-রাসুলদের ওপর ওহি নিয়ে আসা, জালিম সম্প্রদায় ধ্বংস করা ইত্যাদি বিশেষ কাজে নিয়োজিত ছিলেন জিবরিল আলাইহিস সালাম। সেই জিবরিলই বিশেষভাবে নাজিল হতে থাকেন হাসসানের জন্য; শব্দ নিয়ে, মর্ম নিয়ে, ছন্দ নিয়ে! সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি!

সেসব অবতীর্ণ শব্দমালা, জিবরিলের বিশেষ সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা, হাসসানের কবিতাকে এমন ধারালো ও শক্তিশালী করে তুলল, যার ফলে তার কবিতার অন্ত্যমিল আর ছন্দগুলো তিরের চেয়েও বেশি ধারালো হয়ে বিঁধল মুশরিকদের অন্তরে। তার প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থ যেন একেকটি বাহিনী; কবিতাগুলো যেন একেকটি পবিত্র জিহাদ; ছন্দ, অন্ত্যমিল আর পঙ্‌ক্তিগুলো যেন একেকটি উড়ন্ত তির, যা নবিজির দুশমনদের আত্মবিশ্বাস ও মনোবলকে চুরমার করে দিত প্রবলভাবে।

নবিজির যুদ্ধাভিযানগুলোর মুগ্ধকর বর্ণনাও পাওয়া যায় হাসসানের কবিতায়। এমনকি সেসব কবিতা পড়লে মনে হবে আপনি যেন বদরে, উহুদে, মক্কা বিজয়ে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৪৯০

Scanned with CamScanner

সওয়ারি, সফর আর প্রিয়তমার জন্য প্রেমকাব্য রচনায় নিয়োজিত সেই ক্ষয়িষ্ণু প্রতিভা রূপান্তরিত হয় এমন প্রোজ্জ্বল যোগ্যতায়, যা আল্লাহর ইচ্ছায় তাকে হাত ধরে নিয়ে যায় চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে!

জ্ঞান তোমার জন্য হোক আনন্দময়

প্রেরণার বাতিঘর, মহান সেই মানুষটির সাথে একটি ঘটনার স্মৃতি বর্ণনা করেন মহান সাহাবি উবাই ইবনু কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বর্ণনা করেন—একদিন আল্লাহর নবি আমাকে বললেন, 'হে আবুল মুনযির, তুমি কি বলতে পারো, আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি অধিক মর্যাদাপূর্ণ?'

এটা সাধারণ কোনো পরীক্ষামূলক প্রশ্ন ছিল না, এটা তো এমন এক জিজ্ঞাসা, যা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে ধুলিময় প্রান্তর থেকে তুলে এনে আলোর বলয়ে স্থাপন করে, তাকে সাধারণ একজন মানুষ থেকে অনন্য ও অসাধারণ একজন মানুষে পরিণত করে।

উবাই বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুলের প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম—

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জিব ও অবিনশ্বর।[১]

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর শুনে আমার বুকে মৃদু আঘাত করে বললেন, 'হে আবুল মুনযির, জ্ঞান তোমার জন্য সহজ ও আনন্দময় হয়ে উঠুক।'[২]

একটি আত্মাকে সফলভাবে পুনরুজ্জীবিত করা সম্পন্ন হলো। অনুপ্রেরণা ও উজ্জীবনের সকল নিয়ম-কানুন মোতাবেক পরিবর্তন সাধিত হলো! রাসুলুল্লাহর এই একটি কথাই আবুল মুনযিরকে কেবল কুরআন তিলাওয়াতের স্তর থেকে কুরআনের সাথে জীবনযাপনের স্তরে উন্নীত করে। মৃত্যুর আগপর্যন্ত এই মহান সাহাবি কুরআনের আয়াতের সাথেই জেগে উঠতেন, আবার কুরআনের সাথেই নিদ্রা যেতেন।

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫৫

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৮১০

Scanned with CamScanner

নবিজি আরেকবার নিজের ঘর থেকে বের হয়ে সাহাবি উবাই ইবনু কাবের বাড়ির উদ্দেশ্যে গমন করেন একটি বিশেষ সাক্ষাতে! এমন এক সাক্ষাৎ, যাতে নিহিত রয়েছে অতি উচ্চ, অতি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা! নবিজি দরজায় কড়া নাড়েন। উবাই বের হন ঘর থেকে। দরজায় তার জন্য অপেক্ষা করছে তার জীবনের সবচেয়ে উষ্ণ, মধুর ও রোমাঞ্চকর মুহূর্ত। নবিজি উবাইকে বললেন, 'আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন, যেন আমি তোমাকে এই আয়াত পড়ে শোনাই,

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ①

আহলে কিতাব (ইহুদি-খৃষ্টান) ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল, তারা নিবৃত্ত হবে না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসবে।[১]

সেই মুহূর্তে উবাইয়ের মনে অনুভূতির যে তরঙ্গ উথলে উঠেছিল, তার সঠিক বর্ণনা দেওয়ার মতো শব্দ আমার কাছে নেই। সেই অনুভূতির সামনে বিস্মিত, হতভম্ভ, হতবাক—এ জাতীয় শব্দগুলো খুবই তুচ্ছ আর ক্ষুদ্র মনে হবে। এতটা বিস্ময়াভিভূত হওয়ার কারণ সংক্ষিপ্তাকারে উবাইয়ের মুখেই শোনা যাক—

'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আল্লাহ আপনার কাছে আমার নাম ধরে বলেছেন?'

নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ, মহান আল্লাহ আমাকে তোমার নাম ধরে বলেছেন।'

এই কথা শুনে উবাই আনন্দে কাঁদতে শুরু করেন। তার তো না কাঁদার কোনো কারণ নেই।

নবিজির মুখের সেই কথা 'হ্যাঁ, আল্লাহ তোমার নাম ধরে বলেছেন', অনুপ্রেরণার সেই শীতল পরশ তাকে অন্য এক মানুষে পরিণত করেছিল। জমিনের মানুষ থেকে তাকে যেন রূপান্তরিত করেছিল আসমানি এক মানবে।

এমনকি তারাও

এমনকি সাহাবিদের মধ্যে যারা ছিলেন দুর্বল, কম সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন, কোনো সভা-সমাবেশে যাদের মাথা থাকত নত হয়ে, শারীরিক-মানসিক-সামাজিক

[১] সুরা বাইয়িনাহ, আয়াত : ১; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৭১৪৪

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন ত্রুটি ও অল্প মর্যাদার কারণে যাদের চেহারায় লজ্জার আভা ফুটে থাকত—তাদের কাছেও নবিজি তার মহত্তম হৃদয় নিয়ে উপস্থিত হতেন। তাদের ত্রুটি ও কমতিগুলোতে তার সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণার পরশ বুলিয়ে দিতেন। ফলে যে ব্যক্তি মজলিসে মাথা নিচু করে থাকত, কিছুদিনের ব্যবধানেই সে মাথা উঁচু করে চলতে শুরু করত। নববি হাতের সুকোমল পরশ সেই ত্রুটিগুলোকে গুণে, দুর্বলতাগুলোকে শক্তিতে, অক্ষমতাগুলোকে প্রশংসায় পরিণত করত।

সাফওয়ান ইবনু মুয়াত্তালকেই দেখুন। তার ঘুম ছিল ভারী। আল্লাহর রাসুল তার সেই দুর্বলতাকেও সঠিক জায়গায় ব্যবহার করেছেন। তার দায়িত্ব ছিল সবসময় কাফেলার সবচেয়ে পেছনে থাকা, যেন মুসলিম বাহিনীর যাত্রাপথে পড়ে যাওয়া জিনিসগুলো তিনি উঠিয়ে নিতে পারেন। এমনকি অপবাদের ঘটনায় পথের মধ্যে সাফওয়ান ইবনু মুয়াত্তালই উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে পেয়েছিলেন।

অন্ধ সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতুম রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথাই চিন্তা করুন। তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসুলের মুয়াজ্জিন। অনেক যুদ্ধযাত্রাকালেও আল্লাহর রাসুল আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতুমকে মদিনায় তার স্থলাভিষিক্ত করে গেছেন।

এছাড়া কারোর ত্রুটি ও দুর্বলতা থাকলে তিনি তার অন্য কোনো গুণ বা শক্তির জায়গা মানুষকে দেখিয়ে দিতেন এবং সেদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। যেন মানুষের মনে জমে থাকা জাহিলিয়্যাতের ছিটেফোঁটা ঈমানের পবিত্র পানিতে দূর হয়ে যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, এই মহান সাহাবির পা ছিল ক্ষীণকায়। বাতাসে কাপড় সরে গেলে সেটা বের হয়ে যেত, মানুষ তখন হাসিঠাট্টা করত। কিন্তু আল্লাহর রাসুল সেই পা দুটিকে সম্মান, মর্যাদা ও গৌরবের বিষয়বস্তু বানিয়ে দেন তার একটিমাত্র কথার মাধ্যমে। তিনি বলেন, 'ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহর নিক্তিতে এই পা দুটো উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি ভারী ও মর্যাদাসম্পন্ন।'[১]

জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা ধরুন। তিনি দেখতে সুন্দর ছিলেন না। যখন তিনি শহিদ হন, আল্লাহর রাসুল তাকে বিশেষভাবে স্মরণ করেন। তিনি সবার

---

[১] *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৭০৬৯

Scanned with CamScanner

উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি জুলাইবিবকে হারিয়েছি, তার কথা মনে পড়ছে।'[১] নবিজি সবাইকে বোঝাতে চেয়েছেন, একজন মুমিন ও বিশ্বাসী আত্মাকে আমরা হারিয়েছি— এটাই সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাহ্যিক সৌন্দর্য এখানে বিবেচ্য নয়। সুবিন্যস্ত গড়ন কিংবা সুঠাম দেহের মানদণ্ডে নয়, বরং যে মানুষটির অন্তর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে স্পন্দিত হয়, সে দেখতে যেমনই হোক না কেন, মহান রবের কাছে তার মর্যাদা অনেক বেশি।

সাহাবি যাহিরকে দেখুন। তিনি ছিলেন একজন গ্রাম্য ব্যক্তি। একবার নবিজির সাথে তার সাক্ষাৎ হলে, নবিজি এগিয়ে গিয়ে সকল সাহাবির সামনে তাকে বুকে টেনে নিলেন, আর মজা করে বললেন, 'এই গোলামকে কে কিনবে? এই গোলামকে কে কিনবে?'[২]... তখন যাহির বললেন, 'তাহলে তো আমাকে খুবই সস্তা দামে পাবেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ!' তখন আল্লাহর রাসুল তাকে বললেন, 'কিন্তু তুমি তো আল্লাহর কাছে সস্তা নও।'

নবিজির এই কথায় জাহিলিয়্যাতের অবশিষ্ট জঞ্জাল মুহূর্তেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, উড়ে যায় জাহেলি যুগের সমস্ত খড়কুটো। আর প্রবাহিত হয় মহান আল্লাহর বাণীর শীতল বাতাস—

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে মর্যাদাবান হলো ওই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।[৩]

দুর্গম কেল্লা

নবিজি প্রতিনিয়ত মানুষের মাঝে আশার কথা, ভরসার কথা ছড়িয়ে দিতেন। সেই পবিত্র ও প্রেরণাদায়ী কথামালা দুর্বল, ভঙ্গুর মানবহৃদয়গুলো এমন সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করেছিল যে, সেদিকে দৃষ্টি ফেরালে কোনো ফাটল দেখা যেত না।

[১] *বায়হাকি, সুনানুল কুবরা* : ৭০৯০

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ১২৬৪৮

[৩] সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩

Scanned with CamScanner

তিনি যখন মুআয ইবনু জাবালকে জ্ঞান অন্বেষণে আগ্রহী দেখলেন, বললেন, 'কিয়ামতের দিন মুআয আলিমদের চেয়ে এক স্তর বেশি মর্যাদা পাবে।'[১]

'ইলমুল ফারায়েজ' বা সম্পত্তি বণ্টনের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে যায়দ ইবনু সাবিতের মনোযোগ ও আগ্রহ দেখে বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে ফারায়েজের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে যায়দ ইবনু সাবিত।' আর আবু উবাইদার অন্তরে আমানতের প্রতি গুরুত্ব দেখে তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন, 'এই হলো উম্মাহর আমিন বা বিশ্বস্ত ব্যক্তি।'[২]

উহুদের যুদ্ধে তালহার বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে নবিজি বলেছিলেন, 'দুনিয়ার জমিনে হেঁটে চলা কোনো জীবন্ত শহিদকে দেখে যদি কেউ আনন্দিত হতে চায়, তবে সে যেন তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহকে দেখে।'[৩]

আবু হুরায়রা যখন নবিজিকে সেই সৌভাগ্যবান মানুষদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, যারা কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত লাভ করবে, তখন নবিজি আবু হুরায়রার ইলমের প্রতি প্রবল আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'আমি আন্দাজ করেছিলাম, তোমার আগে আমাকে এই কথা কেউ জিজ্ঞেস করবে না।'[৪]

সাহাবি আবু যারের সর্বোচ্চ সত্যবাদিতার গুণ দেখে নবিজি তার সম্পর্কে বলেন, 'এই ধুলোমলিন পৃথিবীতে বাকশক্তিসম্পন্ন মানুষের মাঝে আবু যারের চেয়ে সত্যবাদী মানুষ খুব কমই রয়েছে।'[৫]

আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলামের দুশমনদের ওপরে চমকানো খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের তরবারি দেখে নবিজি তাকে উপাধি দেন, 'আল্লাহর তরবারি।'[৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের হৃদয়ে নির্মলতা ও পবিত্রতার ছোঁয়া লক্ষ করে নবিজি তার প্রশংসায় বলেন, 'আব্দুল্লাহ কতই না ভালো মানুষ; যদি সে রাতের কিছু অংশ

---

[১] *জামিউস সগির* : ১০৮২০; ইবনু আসাকির 'তারিখে দিমাশকে' হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

[২] *জামি তিরমিজি* : ৩৭৯০

[৩] *জামি তিরমিজি* : ৩৭৩৯

[৪] *সহিহ বুখারি* : ৯৯

[৫] *জামি তিরমিজি* : ৩৮০১; *মুসতাদরাক লিল হাকিম* : ৫৪৬১

[৬] *জামি তিরমিজি* : ৩৮৪৬

Scanned with CamScanner

(নফল) সালাত আদায় করত!'[১] সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের সঙ্গীরা তার সম্পর্কে বলেন, 'আল্লাহর রাসুলের সেই কথার পর থেকে ইবনু উমার রাতে খুবই কম সময় ঘুমাতেন!'

এমনই ছিল সাহাবিদের সাথে নবিজির আচরণ। এভাবেই প্রশংসা আর উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে তিনি তৈরি করেছেন সেই প্রজন্মের মানুষগুলো, যাদের মতো প্রজন্ম দ্বিতীয়বার আসা কেবল কঠিনই নয়; বরং অসম্ভব। সে প্রজন্ম ছিল এমন, যাদের মাঝে এমন কোনো ব্যক্তির অস্তিত্বই ছিল না, যার মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের কোনো গুণ নেই!

নবিজি কখনোই চাননি, কোনো সাহাবিকে আল্লাহপ্রদত্ত পরিমণ্ডল ও পরিধি থেকে বের করে নিয়ে আসতে এবং যে পরিসরে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন তার বাইরে নিয়ে যেতে; বরং তিনি তাদের পরিশুদ্ধ করেছেন, তাদের ভেতরের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করে উজ্জীবিত করেছেন, সঞ্জীবিত করেছেন। এভাবেই নবিজি এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করেছেন, ইতিহাসে যারা দ্বিতীয়বার আসবেন না, তাদের কোনো পুনরাবৃত্তি নেই।

[১] সহিহ বুখারি : ১১২২; সহিহ মুসলিম : ২৪৭৯

Scanned with CamScanner

নিষ্পাপের প্রিয়জন

সিরাতের পাতা উল্টাতে উল্টাতে আপনার হয়তো মনে হতে পারে, নবিজির কী ঘটনাবহুল জীবন, কী বিচিত্র রকমের ঘটনা ও দুর্ঘটনার পরম্পরা, দায়িত্ব ও কর্তব্যের কত ভার! আপনি ভাবতে পারেন, এই রকম ব্যস্তত্রস্ত জীবনে কখনো কোনো ছোট্ট শিশুর সাথে কথা বলা কিংবা কোনো শিশুর কষ্টের কারণে তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়া অথবা অল্পবয়সি কোনো বাচ্চার সাথে খেলাধুলা করা অসম্ভব।

কিন্তু আপনাকে অবাক হতে হবে যখন আপনি নবিজির দৈনন্দিন জীবনের পাতাগুলো উল্টাবেন। মহানুভবতা ও মহত্ত্বের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে নবিজির শ্রেষ্ঠত্ব নেই; বরং আপনি যদি আরেকটু সূক্ষ্মভাবে নবিজির এসব দৈনন্দিন গুণাগুণ খেয়াল করেন, তবে আপনার মনে হবে, এ সকল চরিত্রগুণ ও বৈশিষ্ট্যই অধিক উজ্জ্বল ও গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো এটাও মনে হতে পারে যে, এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই নবিজি অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

নবিজি যেমন জীবনের হাজারো ব্যস্ততা সেরেছেন, ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে দ্বীন-প্রচারের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন, দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভারে ব্যস্ত থেকেছেন সর্বদা, তেমনিভাবে ছোটদেরও কোলে নিয়েছেন, নিষ্পাপ শিশুদের আদর-সোহাগ করেছেন, হাত বুলিয়ে দিয়েছেন নিষ্পাপ ইয়াতিম শিশুর মাথায়।

Scanned with CamScanner

উনাইস, তুমি গিয়েছিলে সেখানে?

অল্পবয়সি সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলেন আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ১০ বছর আল্লাহর রাসুলের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ছোটদের সাথে নবিজির আচার-ব্যবহারের কিছু চিত্র আমরা আনাস ইবনু মালিকের সূত্রে জানতে পারি। মদিনার ছোট্ট শিশুটির সাথে নবিজির আচার-আচরণ আমাদের সন্তান লালন-পালন ও তাদের দীক্ষাদান সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে!

নবিজি আদেশ-নিষেধ এমনভাবে করতেন যে, তাতে আদেশ-নিষেধের কোনো ছাপ থাকত না। আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি দীর্ঘ ১০ বছর আল্লাহর রাসুলের সেবা করেছি। কিন্তু তিনি কোনোদিন আমাকে কোনোকিছুর জন্য 'উফ' পর্যন্ত বলেননি। কোনোদিন জবাবদিহি করেননি—এটা কেন করেছ? ওটা কেন করোনি?[১]

আনাস কোনো ফেরেশতা ছিলেন না, যে তিনি কোনো ভুল করবেন না। স্বাভাবিকভাবেই তার অনেক ভুল হতো এবং কাজের প্রতি অবহেলা ছিল। সে সময় তিনি ছোট ছিলেন আর শৈশবে সাধারণ ও ছোটখাটো অনেক ভুল হতেই থাকে। কিন্তু সেসব ভুলত্রুটি সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে নবিজি তার ব্যক্তিত্ব গঠনের দিকে মনোযোগী হতেন। সেসব ভুল থেকে শেখার দরজাটি খোলা রাখতেন। কোনোদিন তাকে তিরস্কার করেননি। এমনকি তার শিশুসুলভ কোনো আচরণের কারণে কখনো মুখেও কিছু বলেননি।

একবার নবিজি আনাসকে একটি প্রয়োজনীয় কাজে পাঠান। যাত্রাপথে খেলাধুলায় মজে থাকা কিছু সমবয়সি শিশুকে দেখতে পান আনাস। তিনি তখন কাজের কথা ভুলে গিয়ে শিশুগুলোর সাথে খেলায় মেতে ওঠেন। শৈশবের নিয়মই এমন; সবকিছু ভুলে খেলাধুলায় মেতে ওঠাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নবিজি বের হয়ে দেখলেন, আনাস অন্য শিশুদের সাথে মহানন্দে খেলছেন। নবিজি তার পেছন দিক থেকে এসে পিঠে হাত রেখে আদর করে বললেন, 'হে উনাইস, তোমাকে যেখানে যেতে বলেছিলাম, গিয়েছিলে সেখানে?' উত্তরে ছোট্ট আনাস বলেন, 'আমি যাব, আল্লাহর রাসুল।'[২]

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৬০৩৮; *জামি তিরমিজি* : ২০১৫

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২৩১০

Scanned with CamScanner

চিন্তা করুন, সাধারণভাবে এমন পরিস্থিতিতে 'উনাইস' বলে আদর করা কিংবা কোমলভাবে পিঠে হাত রেখে স্নেহ দিয়ে কথা বলা কী করে সম্ভব? কিন্তু যিনি মহত্তম মানুষ, তার পক্ষে জীবনের সকল ক্ষেত্র ও পরিস্থিতিতে এমন মহান আচরণ প্রদর্শন করা সম্ভব, যা কেবলই অবাক করে।

হে আবু উমাইর

মদিনার অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য শিশুকে আদর করার জন্য, মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার জন্য, তাদের ছোট্ট হৃদয়ের মণিকোঠায় আনন্দের প্লাবন বইয়ে দেবার জন্য জীবনের শত ব্যস্ততা আর শোরগোলের মাঝেও নবিজি ঠিকই সময় বের করে নিতেন।

একবার নবিজি মদিনার একটি শিশু আবু উমাইরকে দেখতে না পেয়ে তার খোঁজ নিলেন। জানানো হলো, ছোট্ট শিশু উমাইরের ছোট্ট পাখিটি মারা গিয়েছে, তাই তার মন খারাপ। এ কথা শুনে নবিজি গেলেন তাকে সান্ত্বনা দিতে। বললেন, 'হে আবু উমাইর, কোথায় তোমার পাখি নুগাইর?'[১]

নবিজি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বিষয়েও তার অভিধান থেকে খুঁজে বের করতে পারতেন সঠিক ও উপযুক্ত শব্দ এবং দয়া, মায়া, মহানুভবতা আর উদারতার অনুপম ভাষা।

আনাস বলেন, মাঝেমধ্যে নবিজি মজা করে আমার উদ্দেশ্যে বলতেন, 'হে দুই কানওয়ালা।'[২] জীবনকে যারা কঠোরতা ও অনমনীয়তার মধ্য দিয়ে পরিচালনা করতে চায়, তাদের জন্য নবিজির এই সকল মিষ্ট-মধুর আচরণ অপরিচিত মনে হতে পারে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে বলতেন, 'তারা আমার দুনিয়ার দুটি ফুল।'[৩]

সাহাবি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু একটি অসাধারণ বিষয় বর্ণনা করেছেন, যাতে অকৃত্রিমতা ও সরলতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানুভবতা জড়িয়ে আছে। আবু হুরায়রা

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৬১২৯; *সহিহ মুসলিম* : ২১৫০

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৫০০৪

[৩] *সহিহ বুখারি* : ৩৭৫৩

Scanned with CamScanner

বলেন, 'নবিজি হাসানের জন্য নিজের জিহ্বা বের করে দেখাতেন। আর শিশু হাসান জিহ্বার লাল আভা দেখে আনন্দ পেতেন।'[১]

যুদ্ধের ময়দানে যে মানুষটি সিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন, তরবারি উত্তোলন করতেন বর্বর মানুষগুলোর ঘাড় বরাবর, সেই মানুষটিই কী করে হাসানের আনন্দের জন্য জিহ্বা বের করতেন, তা ভেবে আশ্চর্যান্বিত হবেন না। কেননা, তিনি হলেন পৃথিবীর সবচেয়ে মহান হৃদয়ের মানুষ। ভালোবাসা ও দয়াকে তিনি নাগালের ভেতরেই রাখতেন।

কঠিনই নয়; বরং অসম্ভব

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় একটি ছোট্ট মেয়ে আসে। তার নাম উমামা বিনতু আবিল।[২] নিষ্পাপ ছোট্ট মেয়েটি নবিজির কাঁধ ধরে ঝুলে থাকে। সিজদায় গেলে নবিজি তাকে নামিয়ে রাখলেন, আবার দাঁড়ানোর সময় তাকে কাঁধে চড়িয়ে দাঁড়ালেন।[৩]

ছোট-বড় সবার মাঝে মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের গুণ প্রচার করতে চাইলে এই মহত্তম মানুষটির গল্প শোনানোই যথেষ্ট হবে।

একবার নবিজি সালাত আদায় করতে যাচ্ছিলেন। সাথে তার দুই নাতি হাসান ও হুসাইন। নবিজি সালাতের মাঝে তুলনামূলকভাবে একটি সিজদাকে দীর্ঘায়িত করেন। সালাত শেষে সাহাবিরা নবিজির কাছে এই দীর্ঘ সিজদার বিষয়ে জানতে চান। তারা ধারণা করছিলেন, নবিজির হয়তো কোনো ধরনের অসুবিধা হয়েছে অথবা কোনো ওহি নাজিল করা হয়েছে। কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানালেন, তারা যা ভাবছিলেন সেসবের কিছুই নয়। আসল ঘটনা এরচেয়ে অনেক সাধারণ ও হালকা। তিনি বললেন, 'সিজদার সময় আমার এই নাতিটি আমার পিঠে চড়ে বসে। তাই আমি তাকে তাড়া দিয়ে দ্রুত উঠতে চাচ্ছিলাম না, যতক্ষণ না সে নিজ থেকে স্বাচ্ছন্দ্যে নেমে যায়।'[৪]

---

[১] *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৫৫৯৬

[২] উমামা বিনতু আবিল ছিলেন নবিজির নাতনি; যাইনাব রাযিয়াল্লাহু আনহার মেয়ে।

[৩] *সহিহ বুখারি* : ৫১৬; *সহিহ মুসলিম* : ৫৪৩

[৪] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬০৩৩

Scanned with CamScanner

হ্যাঁ, আপনি চাইলে অবাক হতে পারেন! এত মানুষের উপস্থিতি, তারা এসেছেন সালাত আদায় করতে; কিন্তু এর মাঝেও রয়েছে শিশুর ইচ্ছার অবারিত স্বাধীনতা। কোনো কিছুই সেখানে শৈশবের নিষ্পাপ নির্মলতাকে বাধার শিকল পরাবে না। নবিজি তার নাতিকে সালাতের মাঝে কেবল পিঠে ওঠার অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি সিজদাকেও দীর্ঘায়িত করেছেন, যাতে শিশুর মন পরিপূর্ণরূপে আনন্দিত হয়।

এ ছাড়া নবিজি কখনো কখনো জাহেলি যুগের মানুষের অন্তর থেকে রূঢ়তা ও বর্বরতা দূর করার জন্য নিষ্পাপ শিশুদেরও কাজে লাগাতেন। একদিন এক বেদুইন আল্লাহর রাসুলের সাথে বসে ছিল। এ সময় হাসান আল্লাহর রাসুলের কাছে আসেন, হাসান তখন খুব ছোট। নবিজি শিশু হাসানকে চুমু খেয়ে আদর করলেন। এটা দেখে বেদুইনটি কর্কশভাবে জিজ্ঞেস করে উঠল, 'আপনারা কি শিশুদের চুমু খান? আমার দশটি সন্তান, অথচ আমি তাদের কাউকে কখনো চুমু খাইনি।'

বেদুইন ভাবছিল, এটাই হলো পৌরুষের নিশান। তার ধারণা, জীবনের পরিধি এতটাই সংকীর্ণ যে, তা শিশুর জন্য একটি চুম্বনও ধারণ করতে পারবে না। এরপর মানবকুলের শিক্ষক সেই বেদুইনকে বললেন, 'আল্লাহ তোমার অন্তর থেকে রহমত উঠিয়ে নিলে আমি কী করতে পারি?'[১]

মানবতার অনুপম দৃষ্টান্ত তিনি। শিশুদের প্রতি তার স্নেহ ও মমতা সাগরসম হৃদয়ের বিশালতার ক্ষুদ্র একটি নিদর্শন মাত্র।

নবিজি শিশুদের ভালোবাসতেন, তাদের নামকরণ করতেন, অনেককে উপাধিও দিতেন, তাদের সাথে মজা-রসিকতা করতেন, নতুন শিশু জন্মগ্রহণ করলে খেজুর চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন। তাদের ব্যথা-বেদনা ও অসুখ-বিসুখে ব্যাকুল হতেন, তাদের কষ্টে তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত।

তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ, সকল মানবীয় বিষয়েই তার অন্তর সর্বদা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকত। ইতিহাসে তার মতো মানুষের পুনরাবৃত্তি কেবল কঠিনই নয়; বরং অসম্ভব।

[১] *সহিহ বুখারি : ৫৯৯৮*

Scanned with CamScanner

বৃষ্টির সুবাস

নবিজির চেহারায় বিষণ্ণতার ছায়া দেখে একদিন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, 'আমি এমন কিছু বলব যাতে নবিজির চেহারায় হাসি ফুটে ওঠে।'[১]

আশ্চর্য! তার চারপাশের লোকজনও জানতেন, কী তার হাসির চাবিকাঠি! তারা এটাও জানতেন, তিনি মৃদু হাসেন। মাঝেমধ্যে এমন করেও হাসেন যে, তার দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত দেখা যায়।

যারা গোমড়া মুখে চলে, যারা আশপাশের মানুষের মাঝে ভীতি ছড়ানোর জন্য ভ্রু কুঁচকে চলাফেরা করে, তাদের জানিয়ে দিন, নবিজির আগমন হয়েছে, আর তাদের মেকি বেশভূষার দামও ফুরিয়ে গেছে। তারা ফিরে যাক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছেন। যিনি আশপাশের মানুষের মাঝে খুশি ও আনন্দ ছড়িয়ে দেন, ফলে হেসে ওঠে সকল আত্মা, সেই মহত্তম মানুষটি এসেছেন।

জারির ইবনু আব্দিল্লাহ আল-বাজালি বলেন, 'আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে নবিজি যখনই আমাকে দেখতেন, মৃদু হাসি দিতেন।'

কেমন আত্মিক উন্নতা অনুভব করতেন জারির, যখন নবিজি তাকে দেখলেই একটি মৃদু হাসি দিয়ে স্বাগত জানাতেন আর সেই ভালোবাসায় সিক্ত হতো তার অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দুকনা!

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৪৭৮

Scanned with CamScanner

আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনি জায, যিনি অগণিত মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, তাদের স্বভাব চরিত্র পর্যবেক্ষণ করেছেন, রাগ ও হাসির সময়ে তাদের দেখেছেন, তিনি নবিজির ব্যাপারে বলছেন, 'আল্লাহর রাসুলের চেয়ে অধিক পরিমাণে মুচকি হাসতে আমি আর কাউকে দেখিনি।'[১]

তাহলে কৃত্রিম ভাবগাম্ভীর্যের চেষ্টা, কপাল কুঞ্চিত করা এবং ভ্রু কুঁচকানোর কী এমন মূল্য আছে, যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাবগম্ভীর ও সমীহপূর্ণ মানুষটির নির্মল উজ্জ্বল চেহারাজুড়ে মৃদু হাসি লেগেই থাকত!

সিমাক ইবনু হারব, একজন তাবিয়ি। প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ব্যাকুলতা ও ভালোবাসায় তার হৃদয় সদা অস্থির! হৃদয়ের অনিয়ন্ত্রিত আবেগকে শান্ত করার জন্য তিনি আসেন সাহাবি জাবির ইবনু সামুরার নিকট। জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি নবিজির সাথে ওঠাবসা করতেন?'

'হ্যাঁ, অনেক বেশি।'

জাবিরের বলা এই 'বেশি' শব্দটা সিমাক ইবনু হারবের অন্তরকে কেমন পুড়িয়েছে! যেন তার ভেতর থেকে আওয়াজ উঠেছিল—'হায়, যদি এক মুহূর্তের জন্যও পেতাম তার দেখা!'

জাবির এরপর নবিজির সাথে কাটানো সময়ের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন—'নবিজি সূর্যোদয়ের আগপর্যন্ত ফজরের সালাতের জায়নামাজ থেকে উঠতেন না। যখন সূর্য উদিত হতো, তখন তিনি উঠতেন। সে সময় লোকেরা গল্পসল্প করত। জাহেলি যুগের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গল্প করত আর হাসত। সাথে নবিজিও মৃদু হাসতেন।'[২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জাহেলি যুগ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে নিষেধ করতেন না; বরং তার মিষ্টমধুর হাসির দ্বারা অংশ নিতেন তাদের সাথে। যেন এটাই ছিল স্বাভাবিকতা, অকৃত্রিম আচরণ এবং জীবনকে মেকিত্বের সাথে গ্রহণ না করার প্রতি সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ।

---

[১] *জামি তিরমিজি* : ৩৬৪১

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৬৭০

Scanned with CamScanner

মৃদু হাসির নেপথ্যে

যদিও মৃদু হাসি ছিল নবিজির স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য, তবুও অন্যের মন খুশি করার উদ্দেশ্যে তিনি মাঝে মাঝে হাসতেন। নবিজি বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের ধনসম্পদ দিয়ে মানুষকে বেষ্টন করতে পারবে না, কিন্তু তোমাদের চেহারার প্রশস্ততা আর সুন্দর চরিত্র তাদের বেষ্টন করতে পারে।'[১]

নবিজি মৃদু হাসিকে কেবল নিজের বৈশিষ্ট্যগুণন বানিয়েছেন তা নয়; বরং তিনি জানতেন, এমনও অনেক মানুষ আছে যারা স্বচ্ছন্দ ও দীপ্তিময় নয়, যাদের মনোযোগ আকর্ষণ ও সপ্রতিভ আচরণের ক্ষমতা নেই; ফলে হাসির স্বাভাবিক সৌন্দর্য থেকে সামান্য এগিয়ে গিয়ে এর পরোক্ষ ও অন্তর্নিহিত ফলাফলও নবিজি উল্লেখ করেছেন। আর সেটা হলো, মানুষের মন জয় করা। কারণ, 'চেহারার প্রশস্ততা'র আক্ষরিক ব্যাখ্যাই হচ্ছে মৃদু হাসি।

আর এ হাসি দিয়েই নবিজি মানুষের হৃদয় কেড়ে নিতেন এক নিমিষে। তার কাছে যে-ই আসত, সে-ই তার ভক্ত-অনুসারী হয়ে যেত। আর ফিরে যেত জ্ঞান, ঈমান আর মৃদু হাসির মতো অমূল্য সম্পদ নিয়ে।

অতিশয় চরম এক মুহূর্ত

আশ্চর্য কোনো ঘটনা জানতে চান? তবে শুনুন ফাযালা ইবনু উমাইর আল-লায়সিরের ঘটনাটি। তিনি এসেছিলেন এক কঠিন কাজের দায়িত্ব নিয়ে। খুবই কঠিন সে কাজ—নবিজিকে গোপনে হত্যা করা। সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন তিনি। কাজ সফল করতে ধারণ করেছিলেন একজন সাচ্চা মুসলিমের বেশ।

গুনাহ মাফের অজুহাতে একটু একটু করে নবিজির দিকে এগুচ্ছিলেন ফাযালা। চোখে-মুখে তার আল্লাহর প্রতি বিনয় ও একাগ্রতার ছাপ। যেন আল্লাহর যিকিরের ধ্যান তাকে আশপাশের সবকিছুই ভুলিয়ে দিয়েছে।

একসময় নবিজি ও তার মাঝের ব্যবধান কমে এলো। গুঁজে রাখা ছুরিতে হাত দিয়েছেন ফাযালা, ঠিক তখনই আল্লাহর নবি তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে? ফাযালা নাকি?' খুব বিনীত স্বরে ফাযালা বললেন, 'জি, ইয়া রাসুলুল্লাহ,

[১] *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* : ২৬১৬

Scanned with CamScanner

আমি ফাযালা।' নবিজি হয়তো তার চোখের দিকে তাকিয়েছিলেন; তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মনে মনে কী বলছিলে?' ফাযালা উত্তর করলেন, 'কোনোকিছুই না। আমি তো আল্লাহর যিকির করছিলাম!'

ফাযালার মনের ভেতর যে সুপ্ত যুদ্ধ চলছিল, তার শরীর থেকে যে খুনের ঘ্রাণ বেরোচ্ছিল, তার প্রতিটি পদক্ষেপে যে দাফনের আহ্বান ছিল—তার সবটা অস্বীকার করলেন ফাযালা।

ফাযালা বলেন, এরপর নবিজি মৃদু হেসে বললেন, 'আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও।' অতঃপর তার হাত আমার বুকের ওপর রাখলেন। আল্লাহর কসম, নবিজি তার হাত উঠিয়ে নেওয়ার পর আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে তার চেয়ে বেশি প্রিয় আর কেউ রইল না আমার কাছে।[১]

ভাবুন তো একবার! একটি ভয়ানক যুদ্ধ আপনার দিকে ধেয়ে আসছে আর ধূলিঝড় উড়িয়ে এগিয়ে আসা বিশাল বাহিনী দেখে মুচকি হাসছেন আপনি! এ-ও কি সম্ভব? কিন্তু তিনি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

সেই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে এমন মধুর হাসির ব্যাখ্যা বের করা কী করে সম্ভব!

এ তো সেই পবিত্র প্রাণ, যা গুপ্তহত্যার চেয়েও শক্তিশালী, তরবারির চেয়েও ধারালো, সূর্যের চেয়েও অধিক তেজোদীপ্ত।

বৃষ্টিজলে

বৃষ্টির সুবাস আর মেঘের সৌন্দর্যে মাখামাখি এক মৃদু হাসির কথা বর্ণনা করেছেন আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, একবার মদিনাবাসী অনাবৃষ্টিতে আক্রান্ত হলো। নবিজি জুমআর খুতবা দিচ্ছেন। এমন সময় এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, পানির অভাবে আমাদের ছাগল-ভেড়া, গাধা-ঘোড়া সবই ধ্বংস হয়ে গেছে! তাই আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন তিনি আমাদের বৃষ্টির পানিতে সিঞ্চিত করেন।' তখন নবিজি হাত প্রসারিত করে দুআ করেন। আনাস বর্ণনা করেন, তখন আকাশ ছিল কাচের মতো স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। হঠাৎ বাতাস দ্রুত

[১] অনেকে ঘটনাটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে সিয়ার গ্রন্থপ্রণেতাগণ এটা উল্লেখ করেছেন।

Scanned with CamScanner

বইতে থাকে, মেঘমালা ভেসে এসে জমা হয়। এরপর মুষলধারে বৃষ্টি নামে। আমরা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়িতে এলাম। এই বৃষ্টি পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তখন কেউ আল্লাহর রাসুলকে গিয়ে বলে, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, বৃষ্টিতে বাড়িঘর সবকিছু ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন তিনি বৃষ্টি থামিয়ে দেন।'

তখন আল্লাহর রাসুল মৃদু হেসে বলেন, 'হে আল্লাহ, বৃষ্টিকে আমাদের কল্যাণের পক্ষে করে দিন, বিপক্ষে নয়।' আনাস বলেন, 'আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মদিনার আশপাশে মেঘমালা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে, যেন তা একটি বেষ্টনী।'[১]

নবিজি সে সময় কেন মৃদু হাসছিলেন? কী বার্তা দিতে চাচ্ছিলেন তিনি?

হায়! নবিজির হৃদয়ে পূর্ণ সে সৌন্দর্যের ব্যাপ্তি কতটুকু—তা যদি জানতাম একটিবার! কঠোর হৃদয়ের অধিকারীরা যেখানে আশা করেছিল গম্ভীর মুখভঙ্গি, সেখানেও নবিজি তার মৃদু হাসি লুকাননি। পরিস্থিতির জটিলতাকে দাফন দিয়েছিলেন তার হাসি-ঝলমলে দুই চোখের নিচে।

দিনটি ছিল সোমবার

নবিজি সারাটা জীবন মানুষের হৃদয় জয় করেছেন তার মধুর হাসির দ্বারা। এটি যেন তার গোপন সংকেত, যা দিয়ে তিনি প্রবেশ করতেন আত্মার সব গোপন কুঠুরিতে। এমনকি মৃত্যুর আগেও সেই হাসিই ছিল তার একমাত্র ভাষা, মুখমণ্ডলের প্রসন্নতা ও উজ্জ্বলতাই ছিল সেই প্রভাত-সমীরণ, যার শীতল পরশ তিনি তার সাহাবিদের অন্তরসমূহে সযত্নে বুলিয়ে দিতেন।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'সেদিন ছিল সোমবার। সবাই ফজরের সালাতে নিমগ্ন। আর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইমামতি করছেন। তখন হঠাৎ আল্লাহর রাসুল আয়িশার ঘর থেকে পর্দা সরিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সালাতরত মুসল্লিদের দিকে তাকান, এরপর তিনি মৃদু হাসেন।'[২]

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৩৫৮২

[২] *সহিহ বুখারি* : ৭৫৪

Scanned with CamScanner

'সেদিন ছিল সোমবার' কথাটির দিকে মনোযোগ দিন। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু 'সোমবার' বলে কী বোঝাতে চাচ্ছিলেন বলতে পারেন?

তিনি বলতে চাচ্ছেন—এটা সেই দিনের ঘটনা, যে দিনটিতে নবিজি পৃথিবীর বুক থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন।

ব্যথা ও কষ্টে তার বরকতময় দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, জ্বরে দুর্বল হয়ে পড়েছিল শরীর। আর মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডাকছিল তাকে। অথচ মৃদু সেই হাসি তখনো তার সঙ্গী হয়ে ছিল। আহ! আমার বাবা-মা কুরবান হোক তার জন্য!

কীভাবে তিনি হাসিকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও জীবন-সাফল্যে পরিণত করতে পেরেছিলেন? কীভাবে পরাজিত করে দিলেন মরুভূমির রুক্ষ ভাষাকে? কী করে ঢেকে ফেলেছিলেন মেঘাচ্ছন্ন গোমড়া মুখগুলো, ঝাড়েবংশে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিলেন জাহিলিয়্যাতের মিথ্যা অহমিকা?

কেমন করেই বা কৃত্রিম বাহাদুরির লাগাম টেনে ধরেছিলেন, নতুন করে লিখতে শুরু করেছিলেন মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা?

তার স্বভাবে মিশে ছিল সে কোন মহত্ত্ব, তার রুহের মাঝে জড়িয়ে ছিল সে কোন পবিত্রতা। আর তার হাসি, না জানি তাতে ছিল কোন স্নিগ্ধতা!

Scanned with CamScanner

মদিনায় নেমে আসে ঘোর অন্ধকার

সর্বশেষ আলোটি নিভে যাবে, আর অন্ধকার তার রাজত্ব ফিরে পাবে—বিষয়টি এতটা সহজ নয়। যে সকল অন্তর এইমাত্র হৃৎস্পন্দনের সঠিক মর্মটি জানতে পেরেছে, একটু আগেই উপলব্ধি করেছে জীবনের অর্থ, বুঝতে পেরেছে সবেগে প্রবাহিত রক্তের আন্দোলন—সেসব অন্তরের কম্পন বন্ধ করে দেওয়া খুব কঠিন।

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'নবিজি যেদিন মদিনায় প্রবেশ করলেন, সেদিন যেন এর সবকিছুই আলোর বন্যায় ভেসে গিয়েছিল, আর যেদিন তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন, সেদিন মদিনার সবকিছুই ঢাকা পড়েছিল ঘোর আঁধারে।'[১]

মদিনায় বেজে ওঠে বিদায়ের করুণ সুর, ঘনিয়ে আসে বিরহ, অশ্রু আর শোকের মৌসুম। দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নেন মহত্তম মানুষটি।

সেই মানুষটির সাথে বিদায় নেয় উমারের অন্তরে ফোটা স্নিগ্ধ হাসিটি, বিদায় নেয় আবু যারের হৃদয়ের সমস্ত সুখ ও আনন্দ। জীবনের সমস্ত রং মুছে যায় আবু উবাইদার চোখ থেকে।

---

[১] *জামি তিরমিজি* : ৩৬১৮

Scanned with CamScanner

আমার কবরের পাশ দিয়ে...

নবিজির বিদায়ের মাত্র কয়েক মাস আগের কথা। মুআয ইবনু জাবাল মদিনা ছেড়ে ইয়ামান যাচ্ছিলেন। নবিজি মুআযকে বিদায় জানানোর জন্য হাঁটছিলেন তার সাথে। এর কিছুক্ষণ আগে নবিজি মুআযকে বলেছিলেন—وَاللهِ إِنِّيْ أُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ—আল্লাহর শপথ! মুআয, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

হাঁটতে হাঁটতে নবিজি বেদনাভরা কণ্ঠে, খুব ক্ষীণ আওয়াজে বললেন—يَا مُعَاذُ، إِنَّكَ عَسَى أَلَّا تَلْقَانِيْ بَعْدَ عَامِيْ هَذَا—মুআয, হয়তো এ বছরের পর আমার সাক্ষাৎ আর পাবে না তুমি।

এ কথা শুনে মুআযের হৃৎকম্পন যেন থেমে যায়। শোকে স্তব্ধ হয়ে যায় চারিপাশ।

এরপর নবিজি তার কথা পূর্ণ করেন, 'আর হয়তো তুমি এই মসজিদের সামনে এসে দাঁড়াবে, হেঁটে যাবে আমার কবরের পাশ দিয়ে।' অশ্রু এসে জমা হলো মুআযের চোখের কোণে।

কতটা কষ্ট আর হৃদয়-দহনের সীমাহীন বেদনা লুকিয়ে রয়েছে 'আমার কবরের পাশ দিয়ে' কথাটির মাঝে! সেই বেদনার ভার কীভাবে সহ্য করতে পারলেন মুআয? সেই হৃদয়বিদারক সংবাদে কীভাবে পরাজয় স্বীকার না করে শক্ত থাকতে পারলেন?

যদি প্রিয় বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই না থাকেন, তবে এই ফিরে আসার কী মূল্য আছে? যদি এই সূর্য অস্ত চলে যায়, এই মধুর হাসি চোখের আড়াল হয়ে যায়, তবে কেন সফর করে মদিনায় ফিরে আসার এত কষ্ট আর ক্লান্তি?

বিদায়বেলায়

আরাফাহর ময়দান। নবিজি দাঁড়িয়ে আছেন তার সফল জীবন-সংগ্রাম ও প্রকল্পের সামনে; এক লাখেরও অধিক মুসলিমের সামনে।

২০ বছর আগে এদের সবাই হুবালকে সিজদা করত, উজ্জার পূজা করত, মানাতকে ভক্তি-প্রণাম জানাত। আর এখন? সবাই জোর আওয়াজে বলছে—লাব্বাইক! আল্লাহুম্মা লাব্বাইক।

Scanned with CamScanner

যেখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাকে হত্যা করার ছক কষা হয়েছিল, কবি, গণক, পাগল বলা হয়েছিল—ঠিক সেখানেই আজ দাঁড়িয়ে তিনি। অথচ আজকের এক লাখ মানুষের সবাই বলছে—আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই আশ্চর্যতম সফলতা।

সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে তারা সবাই অপেক্ষা করছিলেন। যাদের তিনি নরক থেকে তুলে এনে জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন, তারা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, তাদের প্রেরণার বাতিঘর, প্রিয় নেতা এখন কী বলবেন। হঠাৎ, প্রচণ্ড ধাক্কায় সবকিছু যেন ওলটপালট হয়ে যায়। নবিজি পরিষ্কার কথায় তাদের জানান—

'হয়তো এই বছরটির পর তোমাদের সাথে আমার আর দেখা হবে না।'[১] আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি... সময় এসেছে এখন বিশ্রাম নেওয়ার! যেন একটি আসমানি ডাক তাকে জানিয়ে গিয়েছে—'এখন সময় হয়েছে আপনার শান্তিতে চাদরাবৃত হওয়ার। তেইশটি বছর পার হয়ে গেল, যখন থেকে আল্লাহ আপনার ওপর নাজিল করেছিলেন, 'হে চাদরাবৃত, উঠুন আর সতর্ক করুন'[২] তখন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তিতে চাদরাবৃত হননি।'

তেইশটি বছরের নিরন্তর সংগ্রাম, কষ্টদায়ক সফর...! হে মহত্তম মানুষ, যথেষ্ট ক্লান্ত হয়েছেন আপনি। আপনি এখন বসুন, একটু বিশ্রাম করুন।

আবু হুযাইফার মুক্ত দাস সালিমের অন্তরে 'হয়তো এই বছরটির পর তোমাদের সাথে আমার আর দেখা হবে না'—কথাটির আঘাত কেমন তীব্রতর ছিল? সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের বুকে সেই শব্দমালা কেমন তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ হয়েছিল?

আর আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের হৃদয়াকাশে অনুভূতির কেমন কালো মেঘ জমা হয়েছিল, যখন নবিজি সেই কথাটি বলছিলেন? আর যুবাইর ইবনুল আওয়্যাম কেমন ভেঙে পড়েছিলেন, যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছিলেন, আমি শীঘ্রই তোমাদের ছেড়ে যাব!

---

[১] *জামি তিরমিজি* : ৮৮৬

[২] সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ২

Scanned with CamScanner

চারিদিকের সকল আলোর রেখা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, মৃত্যুর শীতলতা ঘিরে ধরেছিল চারপাশে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও অসহ্য বিচ্ছেদের শোক পুরো ময়দান গ্রাস করে ফেলেছিল। এমন শোকের পরিবেশ পৃথিবীতে আর কখনো আসেনি।

'হয়তো এই বছরটির পর তোমাদের সাথে আমার আর দেখা হবে না'—এই কথার ভার সাহাবিগণ সইবেন কী করে!

নীরব অশ্রু

এমনই আরেকটি বিদায়ী ভাষণে কথা বলছিলেন নবিজি। তিনি স্পষ্টভাবেই বলতে চান বিদায়ের কথা। আবার একই সাথে চান না, কেউ কিছু বুঝতে পারুক।

দুনিয়া থেকে প্রস্থানের পূর্বে সাহাবিদের অন্তরে স্নেহ ও মমতার প্রলেপ বুলাতে চান তিনি। কিন্তু কেউ এখনই পরিপূর্ণভাবে কিছু বুঝুক আর তাদের মনে বেদনার আগুন জ্বলে উঠুক তা-ও তিনি চান না। তাই যাদের বোঝার তারা বুঝে নেবে, এই ভঙ্গিমায় একটু সংকেতপূর্ণভাবে নবিজি বললেন, 'আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া এবং আল্লাহর নিকট যা আছে, এই দুটির একটি বাছাই করে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। অতঃপর বান্দাটি আল্লাহর নিকট যা আছে তা বেছে নিলেন।'[১][২]

সাহাবিগণ নিবিড় মনোযোগের সাথে শুনছিলেন। তারা নবিজির এ কথাটিকে দুনিয়ার ছোট কোনো বিষয় মনে করে স্বাভাবিক থাকলেন। তারা ভেবেছিলেন, পূর্ববর্তী জাতি বনি ইসরাইলের কোনো এক ব্যক্তিকে এই বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দান করা হয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ মসজিদের এক কোণ থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ শোনা যায়। নবিজি বুঝলেন, একমাত্র আবু বকরই এই ইঙ্গিতপূর্ণ কথাটির মর্ম ধরতে পেরেছেন। তাই বললেন, 'কেঁদো না আবু বকর, যদি আমি কাউকে খলিল[৩] হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম।'

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৪৬৬

[২] অর্থাৎ, নবিজির জীবনের শেষ সময়টাতে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মর্মে ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি চাইলে আরও কিছুদিন দুনিয়ায় থাকতে পারেন, আবার চাইলে অনন্ত আখিরাতে পাড়ি জমাতে পারেন। নবিজি দ্বিতীয়টি বেছে নিয়েছিলেন।

[৩] পরম বন্ধু

Scanned with CamScanner

যেন নবিজি এ কথার মাধ্যমে আবু বকরকে সেই বিচ্ছেদের স্মরণ থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন। তবু কি আবু বকরের মন মানে! আরও বেশি কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

ব্যথার অনুভব

যিনি তার আপন হাতে এতদিন মানবতার ব্যথা ও দুঃখ মুছে দিতেন, একসময় তার দরজাতেই ব্যথারা কড়া নাড়তে শুরু করে। প্রিয়তমা স্ত্রী আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা মাথাব্যথায় কাতর হয়ে বললেন, 'হায়, আমার মাথাটা গেল...!'

এ কথা শুনে নবিজি বললেন : 'বরং আমার মাথাটা গেল।'[১] যেন বলতে চাইলেন, হে আয়িশা, প্রকৃত মাথাব্যথা তো আমি অনুভব করছি। কিছুদিন পর আমাকে হারিয়ে পুরো বিশ্ব হাজার বছর ধরে এই ব্যথা সহ্য করবে।

এরপর নবিজি জ্বরে আক্রান্ত হলেন। জ্বরের কারণে তার শারীরিক শক্তি ও চলাচলের সক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিল। দুপাশে দুজনকে ধরে কোনোরকম মাটিতে পা ফেলে হাঁটতে পারছিলেন। নবিজির বরকতময় পা মাটিতে পড়ছে, সেই সাথে সাহাবিদের যন্ত্রণা, মনঃকষ্ট আর সবকিছু যেন মাটিতে আছড়ে পড়ছে!

বরং আমি পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে

মদিনা তখন এক বিশাল দুঃখের তাঁবু। আনসার আর মুহাজিরদের সকল গৃহের বাতিগুলো নিভে গেছে যেন। জানালাগুলো থেকে আসমানের পানে কান্নামাখা দুআ ভাসে, যেন এই প্রদীপ জ্বলতে থাকে; মদিনাকে, আরব ভূখণ্ডকে, সমস্ত বিশ্বকে যেন আলোকিত করতে থাকে।

একসময় নবিজির ব্যথা ও যন্ত্রণা কিছুটা কমে আসে। তিনি তার ঘর থেকে বের হন। সাহাবিগণ সালাত আদায় করছিলেন তখন। নবিজি বের হলেন স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল চেহারায়। তার জীবন-সাধনার সফল দৃশ্যটির প্রতি শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিতে চাইলেন যেন। এরা সকলেই ছিল মূর্তিপূজক। অথচ আজ মহামহিম আল্লাহর দরবারে সিজদা করছে। একটি পবিত্র আনন্দ তার চোখেমুখে উদ্ভাসিত হলো, তার পবিত্র মুখে ফুটে উঠল বিজয় ও শুকরিয়ার স্নিগ্ধ হাসি।

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৭২১৭

Scanned with CamScanner

বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবিগণ নবিজিকে কিছুটা সুস্থ দেখে আবেগে এতটাই উদ্বেলিত হয়েছিলেন যে, তারা খুশি ও আনন্দে সালাত ভঙ্গ করার উপক্রম করেছিলেন। কিছুদিন অদৃশ্য থাকা সেই পবিত্র হাসি আবার ফিরে এসেছে তাদের মাঝে।

নবিজি ঘরে ফিরে আসেন। কিন্তু হঠাৎই ব্যথা আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মা আয়িশা অপেক্ষায় ছিলেন। নবিজি তার কোলে মাথা রাখলেন আর বললেন, 'বরং আমি পরম বন্ধুর সান্নিধ্য চাই, বরং আমি পরম বন্ধুর সান্নিধ্য চাই।' অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রস্তুত হয়ে যান, যেন মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁর পবিত্রতম রুহটি নেওয়া শুরু করতে পারেন।

দুর্দশার কালো মেঘ

মদিনায় নেমে আসে দুর্দশার কালো মেঘ। নবিজির মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। সংবাদ শুনে সাহাবিগণ বাকরুদ্ধ হন। এই কালবোশেখি সংবাদের ঝড় ধৈর্যবৃক্ষের একটি পাতাও যেন অবশিষ্ট রাখল না। অন্ধকার হয়ে আসা মদিনার বাতাসে যেন সেসব পাতা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল।

গতকাল পর্যন্ত যা ছিল ছায়াময় সুখের বাগান, তা আজ তছনছ হয়ে নির্জন মরুতে পরিণত হয়েছে। সেই অন্তরগুলো কী করে নিজেদের সামলাবে, যাদের ওপর ধসে পড়েছে চিরকালীন বিচ্ছেদের অতিকায় পাহাড়!

সে সময় আবু বকর মদিনার 'সুনহ' এলাকায় ছিলেন। তার কাছে নবিজির মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছল। সেই মুহূর্তে তার চেহারায় যে কালো আঁধার নেমে এসেছিল, তার পরিধি জিজ্ঞেস করবেন না! আবু বকর রাসুলুল্লাহর ঘরে আসেন। চেহারার কাপড় সরিয়ে তাকে দেখেন। তিনি সেই বরকতময় চেহারায় দেখতে পান নূরের ঝলকানি, দেখতে পান হিদায়াতের ইশারা, দেখতে পান ইতিহাস আর অজস্র স্মৃতির আনাগোনা।

আবু বকর বিদায়ী চুম্বন করেন তাকে। চোখের অশ্রু আর শোকের ধ্বনি আবু বকরের হৃদয়ের সেই ভয়াবহ শূন্যতা পূরণ করতে পারবে কি? এরপর তিনি বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, জীবনে ও মরণে উভয় অবস্থাতেই আপনি উত্তম ছিলেন!'

আবু বকর কাতরধ্বনিতে বলেননি, 'হে প্রিয় নবি, আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না।' তবু পুরো বিশ্বজাহান সেই আর্তচিৎকার ঠিকই শুনতে পেয়েছে।

Scanned with CamScanner

সিদ্দিক উঠে দাঁড়ান। তার কাঁধে বিচ্ছেদের কঠিন পাহাড়। উদ্বেগ আর অস্থিরতায় মানুষ বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার আগেই তাকে উঠতে হবে। সবাইকে শান্ত করতে হবে। হঠাৎ তার চোখ পড়ে উমারের ওপর। তরবারি উঁচিয়ে তেজোদীপ্ত ভঙ্গিতে তিনি মসজিদে সমবেত সবাইকে বলছেন—যার ধারণা মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেছেন, তার গর্দান আমি উড়িয়ে দেবো!

এরপর নবিজির সবচেয়ে কাছের মানুষ, যিনি নবিজি সম্পর্কে, নবিজির আনিত শরিয়ত ও তার মহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত, সেই সিদ্দিক এসে বলেন, 'হে উমার, শান্ত হও, চুপ থাকো।'

তিনি সবার সামনে দাঁড়িয়ে সেই অনিশ্চিত আর দ্বিধাগ্রস্ত হৃদয়গুলোর উদ্দেশ্যে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'যে মুহাম্মাদের ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক, মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেছেন।'

এ কথা শুনে উমার প্রচণ্ড ধাক্কায় বিহ্বল হয়ে মাটিতে বসে পড়েন।

এরপর আবু বকর এই আয়াত তিলাওয়াত করেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

> আর মুহাম্মাদ একজন রাসুল বৈ তো কিছু নন। তার পূর্বেই গত হয়েছেন বহু রাসুল। তবে কি তিনি মৃত্যুবরণ করলে অথবা নিহত হলে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে?[১]

উমার জ্ঞান হারালেন। হঠাৎ সেই স্বপ্নের দ্বীপ চোখের সীমানা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, যেখানে ভেড়াতে চেয়েছিলেন তার ভাঙা জাহাজখানি। তার জখমি হৃদয় মুক্তির শেষ সুযোগটিও যেন হারিয়ে ফেলল। উমার কিছুতেই ভাবতে পারলেন না, নবিজি দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন।

এভাবে কেউ মারা যেতে পারে? আমাকে 'বিদায়' না জানিয়ে! 'বিদায়' না বলে! আমি ছিলাম জীবনের নর্দমায় পড়ে থাকা নিকৃষ্ট একজন মানুষ, যে দাসীদের প্রহার আর গোলামদের ধমক দেওয়া ছাড়া কিছুই জানত না। আর আজ আমি উমার

---

[১] সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৪৪

Scanned with CamScanner

আল-ফারুক হয়েছি, শয়তান ও দুরাচারী মানুষ আমাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়। যিনি আমাকে সেই নর্দমা থেকে তুলে এনেছিলেন, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন! আজকের পর থেকে তার সাথে আর বসতে পারব না! আরেকটি বার তার হাত ধরতে পারব না, বলতে পারব না, ইয়া রাসুলুল্লাহ!

ওদিকে ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলেন উসমান ইবনু আফফান। লোকজন তার সাথে কথা বলছিল, কিন্তু তিনি কারো সাথেই কথা বলতে পারছিলেন না। দু-চোখে তিনি কেবল নবিজির মৃত দেহখানিই দেখছিলেন, যা সমস্ত দিগন্তকে চারদিক থেকে শোকাচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

আর আলির কথা? এই সংবাদ শোনামাত্রই সমস্ত শক্তি হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন তিনি। আর আনাস ইবনু মালিক বিক্ষিপ্ত মনে হেঁটে চলেছিলেন মদিনার পথে-প্রান্তরে। দেখেছিলেন, মদিনা আজ অন্ধকার।

যখন আল্লাহর রাসুলকে কবরে দাফন করা হচ্ছিল তখন ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহর রাসুলকে মাটিতে দাফন করতে তোমাদের মন কী করে সায় দিলো![১]

এমন আরও হাজারো প্রশ্নের তির ছিন্নভিন্ন করে ফেলছিল শোকে মুহ্যমান মদিনার হৃদয়কে—আগামীকাল কীভাবে সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে ফিরবে তুমি মদিনা? কোনদিকে সকালের সূর্য উদিত হবে তোমার? ঘুমন্ত পাখিদের আগামী সকালে এই সংবাদ কীভাবে শোনাবে তুমি?

ফেরার পথে

নবিজিকে কবরে রেখে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে। এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তারা বাড়ি ফিরবেন কী করে! দুনিয়ার সবকিছুই তার সমস্ত স্বাদ-গন্ধ, রং আর চমক হারিয়ে ফেলেছে। পথঘাটে, কাপড়-চোপড়ে, কণ্ঠস্বরে আর মানুষের চেহারায়, কেবল ধূসর রং। পুরো মদিনা মলিন ও নিষ্প্রভ চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে। একটা হাহাকার, একটা অস্ফুট আর্তনাদ মদিনার বাতাসে ক্ষণে-ক্ষণে গুঞ্জরিত হতে থাকে।

---

[১] সহিহ বুখারি : ৪৪৬২

Scanned with CamScanner

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু সেই অনুভূতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'আমরা নিজেদের যেন চিনতে পারছিলাম না।' শুধু অলিগলি আর পথঘাট নয়, আমরা যেন নিজেদেরই চিনতে পারছিলাম না।

তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহর মনে হচ্ছিল, যেন তিনি তালহা নন। আবু হুরায়রার মনে হচ্ছিল, তার ভেতরে আবু হুরায়রা নয়, অন্য কারো বসবাস। আর আনাস ইবনু মালিক হারিয়ে ফেলেছিলেন স্বয়ং আনাস ইবনু মালিককে।

পাখিদের নীড়

আবু বকর এবং উমার আল্লাহর রাসুলের স্মৃতি জাগ্রত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। একদিন তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, উম্মু আইমানকে[১] দেখতে যাবেন। যেমনিভাবে আল্লাহর রাসুল তাকে দেখতে যেতেন। তারা যখন উম্মু আইমানের কাছে পৌঁছলেন, উম্মু আইমান কাঁদতে শুরু করলেন। তারা জানতে চাইলেন, 'আপনি কাঁদছেন কেন? নিশ্চয় আল্লাহর কাছে যা আছে, তা-ই তাঁর রাসুলের জন্য উত্তম।'

উম্মু আইমান বললেন, 'আমি জানি, আল্লাহর কাছে যা আছে তা-ই আল্লাহর রাসুলের জন্য উত্তম এবং আল্লাহর রাসুল যেখানে ছিলেন তার চেয়ে উত্তম স্থানে চলে গিয়েছেন। কিন্তু আমি কাঁদছি এই কারণে যে, আসমান থেকে ওহি আসা বন্ধ হয়ে গেল!'

উম্মু আইমানের এই কথায় আবু বকর ও উমার অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। উম্মু আইমানের সাথে তারাও কাঁদতে লাগলেন।

আল্লাহর রাসুলের মৃত্যুর পর সাহাবিগণ হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। সকল চেহারায় যেন তারা প্রিয় হাবিবের মুখ দেখতে পান, সমস্ত খুশবুতে যেন প্রিয় হাবিবের সুগন্ধি খুঁজে পান, সকল আওয়াজেই যেন কেবল তারই আওয়াজ শোনা যায়।

বিলাল ইবনু রাবাহর সেই দরাজ কণ্ঠের আজান কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। আগের মতো আজানের সেই আওয়াজ আর ছড়িয়ে দিতে পারেন না তিনি। তার কণ্ঠনালি যেন অবশ হয়ে পড়েছে, আজান দেওয়া ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। তার

---

[১] উম্মু আইমান হচ্ছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচারিকা। যিনি শিশুবেলায় নবিজিকে মাতৃস্নেহে প্রতিপালন করেন। নবিজি তাকে শ্রদ্ধা করতেন, তার খোঁজখবর নিতেন।

Scanned with CamScanner

আজানের ধ্বনিতে আপন নীড়ে ফিরতে থাকা পাখিরা এখন উড়তে ভুলে গেছে। মহান মানুষটি এই পৃথিবীতে থাকাকালীন যেভাবে তারা আকাশে উড়ে বেড়াত, এখন আর সেভাবে উড়তে পারে না।

দুর্বল আর নিঃশেষিত হতে হতে বিলাল কিছুদিন মদিনায় অবস্থান করেন। নবিজির মসজিদ, তার মিম্বার, ঘরবাড়ি—সবকিছুই প্রতিমুহূর্তে বিলালকে স্মৃতির অনলে পোড়াতে থাকে। স্মৃতির দহন থেকে বাঁচতে বিলাল মদিনা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। ব্যথিত চিত্ত হালকা করতে তিনি যাত্রা করেন শামের পথে। আহ বিলাল! সেই যাত্রাপথের প্রতিটি ধূলিকণা থেকেও যেন শোনা যাচ্ছিল কান্নার করুণ সুর। শোকের মাতমে যেন সেই পথের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল।

স্মৃতির আঙিনা

স্মৃতির যন্ত্রণা বড়ই অসহনীয়! স্মৃতির আঙিনায় যন্ত্রণা ফিরে আসে শতগুণ। মসজিদ ও মিম্বারে সেই ঘ্রাণ অনুভূত হয়, প্রতিটি কথায় তার স্বরের ধ্বনি বেজে ওঠে। প্রতিটি আজানে সেই বরকতময় চেহারা ভেসে ওঠে, সেই স্নিগ্ধ হাসির কমনীয়তা উদ্ভাসিত হয় হৃদয়ের আঙিনায়।

নিঃস্ব ও অসহায় মুআয! কেউ কাঁধে হাত দিলে চমকে তাকান, খুঁজে ফেরেন প্রাণের নবিকে। কিন্তু কোথায় সেই মহান মানুষটি? কোথায় সেই পবিত্র হাতের স্পর্শ? তিনি যে আর কোথাও নেই!

বিষণ্ণ ও শোকাহত আবু বকর। বাতাসের প্রবাহে যখন ঘরের দরজা কেঁপে ওঠে, দ্রুতপদে বের হয়ে আসেন। তবু দেখা মেলে না প্রিয়তম মানুষটির।

ছোট্ট শিশু আবু উমাইর। হায় আবু উমাইর! আর কেউ কখনো আসেনি তাকে জিজ্ঞেস করতে—কেমন আছে তোমার ছোট্ট নুগাইর?

সর্বহারা বিলাল! সেই মহান কণ্ঠস্বর তিনি আর কখনো শুনতে পাননি, যা তাকে সর্বদাই বলত—চলো বিলাল, আমাদেরকে সালাতে আহ্বানের মাধ্যমে প্রশান্তি দান করো।

অভাগা উমার! কেউ তাকে আর বলেনি—ভাই আমার, তোমার দুআয় আমাকে ভুলো না যেন।

Scanned with CamScanner

দুখিনী মদিনা! তার আকাশে উদিত মহান আলোকরশ্মিটিকে সে হারিয়ে ফেলেছে চিরতরে। তার স্থলে-জলে, লতায়-পাতায়, ফুলে-ফলে ছড়ানো মুগ্ধকর সুবাসটিকে সে আর খুঁজে পাবে না কোথাও। মদিনা আজ নিঃস্ব, অসহায়। সে খুইয়ে ফেলেছে জগতের রহমতকে, হারিয়ে ফেলেছে ধরণির মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম মানুষটিকে।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

Scanned with CamScanner

তারা ছিল লাত-উজ্জার পূজারি। তাদের মন মরুদেশের রুক্ষতায় ভরপুর। অন্তরে কেবল ছলচাতুরী আর মিথ্যের বেসাতি। তারা সূর্যের প্রখর তাপের মতো নির্দয়, নিষ্ঠুর। যত কালিমা, যত অমানিশা, পাপাচার—সব যখন পরিণত হয়েছে তাদের নিত্যস্বভাবে, ঠিক তখনই আগমন ঘটল এক নিষ্পাপ মহামানবের। তিনি এলেন মেকিত্বে ডুবে থাকা সেই মূর্খ জাতিকে সত্যের পথ দেখাতে।

তিনি এসেছেন মহানুভবতা, ভালোবাসা আর বিশ্বস্ততার প্রতীক হয়ে। তার শুভাগমন ঘটেছে মহান রবের পক্ষ থেকে এক আলো-ঝলমলে বার্তা নিয়ে, যে আলোয় ভেসে যায় সমস্ত অনাচার, মুছে যায় সব মিথ্যে উপাস্যের ঠুনকো অস্তিত্ব। তিনি জানেন ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতে। তিনি জানেন সকলের মাঝে ভালোবাসার বীজ বুনে দিতে। তিনিই আমার নবি। তিনিই আমার প্রাণের নবি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

বিক্রয়কেন্দ্র :
১১/১, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬

সমকালীন প্রকাশন

Scanned with CamScanner